বিপ্লবী বিবেকানন্দ

(নাটক)

বিপ্লবী বিবেকানন্দ

(নাটক)

শ্রীঅমল সরকার এম. এ

প্রকাশক :

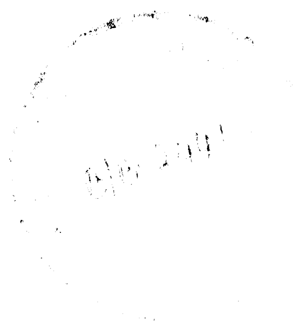
শ্রীভারতী পাবলিশার্স

৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা—১২

প্রথম সংস্করণ ঃ
পয়লা আষাঢ় ১৩৭০

মুদ্রাকর ঃ—
শ্রীকমল ভট্টাচার্য্য
লক্ষ্মী প্রিন্টিং এণ্ড কো
৭, শুঁড়া ক্রশ লেন,
কলিকাতা-১০

মূল্য ঃ একটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা



নাট্যকারের প্রাক্তন সহকর্মী

ব্রহ্মচারী ৺ ভোলানাথ রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

[৺ ভোলানাথ রায়ের নিকট প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রথম সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ বানপ্রস্থ আশ্রমে অর্পিত হইবে।]

ভূমিকা

সরোবরের জল স্বচ্ছ-শান্ত। ছোট্ট একটা ঢিল সেই স্বচ্ছতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে তার মাঝে জাগিয়ে তোলে আলোড়ন। শতবর্ষ আগে—১৮৬৩ সাল, ১২ই জানুয়ারী কলকাতায় সিমলায় দত্তপরিবারে জন্ম গ্রহণ করল একটি ছোট্ট শিশু। কে জানতো এই শিশু একদিন বাংলার বুকে—ভারতের বুকে—সমগ্র বিশ্বের বুকে জাগিয়ে তুলবে এক উদ্বেলিত আলোড়ন। প্রচলিত রীতিনীতিকে ভেঙ্গে ফেলারই নাম বিপ্লব। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজ—অর্থনীতি আর ভেদনীতির চাপে দ্বিধাবিভক্ত। একধারে সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য আর ব্রাহ্মণেতর এর জন্য ঘৃণা অবজ্ঞা-নীচবর্ণের ছায়ামাড়ানও পাপ। আর অন্যধারে অর্থশালী ধনী-সম্প্রদায় দীনদরিদ্রকে শোষণ করছে—ঠিক যেমন শোষণ চালিয়েছে পরাধীন ভারতের বুকে বৃটিশরাজ। দুঃশাসনচক্রের এই পরাধীনতার গ্লানিকে ভেঙে চুরমার করতে এগিয়ে এলেন যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ শিষ্য বেদান্তবাদী বিপ্লবী বিবেকানন্দ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন যন্ত্রী—আর স্বামী বিবেকানন্দ যন্ত্র। যন্ত্রকে মন্ত্রবলে চালিয়ে দিয়ে যন্ত্রী পড়লেন সরে—আর যন্ত্র আপন সৌম্য-বীর্যে শাশ্বত মহিমায় দিক্ হ'তে দিগন্তে ছুটে চলেছেন, হিমালয়ের পাদদেশ হ'তে ভারতের শেষ সীমায় সমুদ্র সৈকতের বেলাভূমি কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। আত্মাভিমানী বিলাসী ধনী রাজন্যবর্গের শির আপনা হ'তে নত হয়েছে ভিখারী গৈরিকধারী সন্ন্যাসীর চরণতলে। মহামহা পণ্ডিত এসেছেন তর্কে স্বামীজিকে বিধ্বস্ত করতে—তাদের শিরও নত হয়েছে স্বামীজির অগাধ পাণ্ডিত্যের কাছে। বুদ্ধদেবের তপস্যায় বিঘ্ন করতে এসেছিল মার। আর বিদেশে স্বামীজির খ্যাতিতে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পাঠান হয় ছলনাময়ী কয়েকজন আমেরিকান নারীকে। গুরুর কৃপায় যিনি শিখেছিলেন সমগ্র নারী জাতিকে মাতৃসম্বোধন করতে তাঁর কাছে ছলনাময়ীদের লীলাচাতুর্য্য কতক্ষণ? মাতৃসম্বোধন শুনে চৈতন্য হ'ল তাদের এবং যারা স্বামীজির কুৎসা রটনা করবার চেষ্টা করেছিলেন তাদের।

স্বামীজি বলেছেন—"দারিদ্র্যমোচনের ব্রত নাও সকলে। আমি জানি ভগবান সাহায্য করবেন। আমি এদেশে অনাহারে বা শীতে মরতে পারি। কিন্তু তোমাদের কাছে গরীব অজ্ঞ, অত্যাচার পীড়িতদের জন্যে এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে। যিনি গোকুলে দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করতে সঙ্কুচিত হ'ন নি, যিনি তাঁর বুদ্ধাবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে এক অধমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাকে উদ্ধার করেছিলেন—যাও তাঁর কাছে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে পড়ে যাও, এবং তাঁকে এক মহাবলি প্রদান কর—বলি জীবনবলি, তাদের জন্যে, যাদের জন্যে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, যাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালোবাসেন, সেই দীনদরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্যে তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্যে ব্রত গ্রহণ করো—যারা দিন দিন ডুবছে।"

মহানগরী কলকাতার অধিবাসীগণের পক্ষ থেকে স্বামীজিকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হ'ল ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ শোভাবাজার রাজবাড়ীতে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুরের সভাপতিত্বে। সমবেত যুবকগণকে সম্বোধন ক'রে উদাত্ত কণ্ঠ ধ্বনিত হ'ল—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত। ওঠ, জাগো, আর ঘুমিয়ে কাল কাটিয়ো না। শুভ মুহূর্ত্ত আগত। আমিও একদিন বালক ছিলাম তোমাদেরই মত। তোমাদেরই মত খেলাধূলা করে বেড়িয়েছি পথে পথে। ওঠ, জাগো, জগৎ তোমাদের আহ্বান করছে। অনন্ত কাজ পড়ে আছে তোমাদের জন্যে। আমি তো এখনো কিছুই করতে পারিনি—তোমাদেরই সব করতে হ'বে। আমি যদি এতদূর করতে পারি—তোমরা আমার চেয়ে আরও কত বেশী করতে পার। আমার দেশের উপর আমি বিশ্বাস রাখি—বিশেষতঃ আমার দেশের যুবকদের উপর আমার বিশ্বাস অগাধ।" আজ শতবর্ষ পরে সময় এসেছে দেশের লোকের স্মরণ করবার কতটুকু স্বামীজি করেছিলেন, আর কতটুকু আমারা—তাঁর দেশবাসীরা করতে পারতুম কিন্তু করি নি—তাঁর অগাধ বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারি নি।

স্বামীজি সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলবার আছে কিন্তু তাহলে ভূমিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যাবে। তাই এবার নাটক সম্বন্ধে দুই একটা

কথা বলতে চাই। নাটকে তিনটি Data থাকা প্রয়োজন বলেছেন এ্যারিষ্টটল্ ও তাঁর ভক্তবৃন্দ। Unity of Time, Place and Action. কিন্তু জীবনি নিয়ে নাটক লিখতে গেলে প্রথম দুটোকে ত্যাগ করতে হ'বে। Unity of Time—স্বামীজির ক্ষেত্রে অবশ্য এর বিস্তৃতি খুব প্রখর না কারণ তিনি জীবনধারণ করেছিলেন মাত্র ৩৯ বছর। এত স্বল্প সময়ে এত কাজ করা সম্ভব যে কেমন করে হ'তে পারে তা ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অল্প সময়ের মধ্যে যশের অধিকারী হয়েছিলেন অবশ্য ইংরেজ কবি 'কিট্‌স্'। মাত্র ৩৬ বছরের জীবনের সাক্ষর তিনি রেখে গেছেন ইংরেজী সাহিত্যে। কিন্তু একাধারে সাহিত্যের সেবা, দেশের সেবা, দরিদ্রজনগণের সেবা, সাহিত্যিক, পরিব্রাজক, ধর্ম্মসংস্কারক, দরদী সন্ন্যাসী, কর্ম্মযোগের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ আর কেউ কি এত কম সময়ে এত কাজ করতে পেরেছেন? Unity of Place—সময়টা খুব বেশী না হলেও বহুস্থানে তিনি ঘুরেছিলেন। কাজেই তাঁর জীবন নাট্যে স্থান সংক্ষেপ করা সম্ভবপর নয়। ভারতের প্রতিটি সহরে, আমেরিকায় ও ইউরোপে কোথায় না তিনি ভারতের শাশ্বতবাণী বহন করে গেছেন? Unity of Action—এ ছাড়া নাটক সম্ভর নয়। কাজেই action রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে এ নাটকেও।

নাটক—নাটক, ইতিহাস নয়। তাই নাটক লিখতে গেলে নাট্যকারের একটু স্বাধীনতা থাকে। সেই অধিকারেই 'কেবলরাম' ও 'ক্ষান্তমণি' দুটি চরিত্রের স্বষ্টি। এ বিষয়ে মহাকবি গিরীশচন্দ্রের পন্থাই অবলম্বন করেছি। পরমভক্ত নটগুরুর কাছে আমার ঋণ পদে পদে। স্বামীজি তাঁকে ডাকতেন—'জি, সি', জিসির গান তিনি খুবই ভালবাসতেন এবং প্রায়ই নিজে গাইতেন। তাই এই নাটকে বেশ কয়েকটি গানই নেওয়া হয়েছে গিরীশচন্দ্রের কয়েকটি নাটক থেকে। অবশ্য শেষ গানটি স্বামীজির নিজের রচনা। মহাপুরুষদের জীবনি নিয়ে নাটক লেখা যায় এটা দেখালেন প্রথম গিরীশচন্দ্রই তাঁর 'শঙ্করাচার্য্য', 'বুদ্ধদেবচরিত' 'চৈতন্যলীলা', প্রভৃতি নাটকে। তাই ভক্ত প্রবর গিরীশচন্দ্রকে জানাই আনার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এ ছাড়াও এই নাটক লিখতে সাহায্য গ্রহণ করেছি—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদের 'মুক্ত পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ', শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ' (১ম ও ২য় খণ্ড),

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত 'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ', শ্রীপ্রমথনাথ বসু রচিত 'স্বামী বিবেকানন্দ (১ম-৪র্থ খণ্ড), শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত ও স্বামী সদাশিবানন্দ রচিত 'কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ', স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ পার্যদ-প্রসঙ্গ', শ্রীদুর্গাপুরী দেবী রচিত 'সারদা-রামকৃষ্ণ', শ্রীশরৎচন্দ্রর চক্রবর্ত্তী প্রণিত 'স্বামীশিষ্য সংবাদ', স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ' ও নিবেদিতা প্রণিত 'The Master as I saw him.' যে ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে নিবেদিতা লিখেছিলেন, 'The Master as I saw him—সে শ্রদ্ধাভক্তি আমি পাব কোথায়? কাজেই নাটক লিখতে গিয়ে হয়তো এই মহাপুরুষের জীবনচরিত যথোচিতরূপে চিত্রিত করতে পারি নি, তাই ক্ষমা চাই সেই ক্ষমাসুন্দন বিপ্লবী বিবেকানন্দের কাছে।

'অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটক লেখবার পরই ইচ্ছে হয় এরপর স্বামীজিকে নিয়ে নাটক লিখতে হবে। কিন্তু সে ইচ্ছে অনেকদিনই সুপ্ত ছিল। তারপর হঠাৎ একদিন আমার অপরিচিত কয়েকজন আমাকে স্বামীজির জীবন নিয়ে যাত্রা করবার জন্য একখানা নাটক লিখে দিতে বলেন। কিন্তু সে ইচ্ছেও ফলপ্রসূ হয়নি নিজে বিশেষ অসুস্থ হওয়ায়। তারপর অনুজ প্রতিম বন্ধুবর শ্রীবিমল ভট্টাচার্য্য আমাকে প্ররোচিত করতে থাকেন এবং এ সম্বন্ধে বহু বই সংগ্রহ করে দিয়ে আমার অশেষ উপকার করেন। তাঁর সাহায্য না পেলে কোনদিনই এই নাটক লেখা হ'তে পারতো না। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের সম্পর্ক ছোট করতে চাই না। আর যে সব বন্ধু নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তাদেরও স্মরণ করি এই সঙ্গে। যদি 'গুরুশিষ্য' নামে এক বৃহৎ নাটকের অবতারণা করা যায় তাহলে তারই প্রথম খণ্ড হবে 'অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ', দ্বিতীয় খণ্ড হবে 'বিপ্লবী বিবেকানন্দ' আর যদি কখনও সুযোগ সুবিধা হয়তো তৃতীয় খণ্ড হবে 'সেবিকা নিবেদিতা'। আর একটা কথা বলা দরকার। নাটকে অনেকগুলি স্ত্রীচরিত্র হয়ে গেছে। সৌখীন সম্প্রদায়ের অভিনয় করতে যদি অসুবিধা হয় তো একজনকে দিয়ে দুটো চরিত্রও অভিনয় করান যেতে পারে। প্রয়োজন বোধে নাটকের মধ্যে তৃতীয় ব্রাকেট দেওয়া অংশ অভিনয়ের সময় বাদ দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম অভিনয় রজনীর জন্য প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীবিপিন গুপ্ত—

শ্রদ্ধেয় "বিপিনদা" এই নাটকটির বৃহদাকার কমিয়ে অভিনয়োপযোগী করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

পরমহংসদেব তাঁর শিষ্যদের সন্ন্যাসনামকরণ করেন নি—করেছিলেন স্বামীজি পরবর্ত্তীকালে। কিন্তু নাট্যকারের স্বাধীনতা নিয়ে একটু বদল করেছি নাটকিয় করবার জন্য। প্রয়োজনবোধে সে অংশটুকুও বাদ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে তাঁর শিষ্যদের সন্ন্যাসের প্রতীক গেরুয়া বস্ত্র দিয়েছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—"কাশীপুরে বাসকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহাদের এগার জনকে গৈরিক বস্ত্র দান করিয়াছিলেন।"

সর্ব্বশেষে স্বামীজির লেখা Kali the Mother থেকে কয়েকটা পংক্তি উদ্ধৃত করে শেষ করতে চাই—

"কালী তুই প্রলয়রূপিনী, আয় মা গো, আয় মোর পাশে।
সাহসে যে দুঃখ-দৈন্য চায়,—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে ;—
কাল নৃত্য করে উপভোগ—মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।"

জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ, জয়তু স্বামী বিবেকানন্দ।

১লা বৈশাখ ১৩৭০
৭৪বি, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৪

অমল সরকার

চরিত্র

শিব	
শ্রীরামকৃষ্ণ—	অবতার
নরেন—	ঐ শিষ্য, পরে বিবেকানন্দ
রাখাল—	ঐ শিষ্য, পরে ব্রহ্মানন্দ
শরৎ—	ঐ শিষ্য, পরে সারদানন্দ
কালী—	ঐ শিষ্য, পরে অভেদানন্দ
লাটু—	ঐ শিষ্য, পরে অদ্ভুতানন্দ
শশি—	ঐ শিষ্য, পরে রামকৃষ্ণানন্দ
নিরঞ্জন—	ঐ শিষ্য, পরে নিরঞ্জনানন্দ
বাবুরাম—	ঐ শিষ্য, পরে প্রেমানন্দ
রাজীবলোচন—	নরেনের জ্ঞাতি
কেবলরাম—	জনৈক পুর্ব্ববঙ্গবাসী যুবক
সাধু নাগমশাই—	শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহশিষ্য
গিরীশ—	শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহশিষ্য, নট ও নাট্যকার
পওহারীবাবা—	সাধু
হাজরা—	দক্ষিণেশ্বরের জনৈক ভক্ত
বলাই, রমেশ—	যুবকদ্বয়
হেমেন্দ্র—	বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় কার্ত্তিক বসুর পিতা
গোরাসৈন্যদ্বয়	
সন্ন্যাসী—	জনৈক সন্ন্যাসী
রঘু—	ডাকাত সর্দ্দার
ডাকাতগণ—	
কিষেণলাল—	মেথর
চোর—	জনৈক তস্কর

মঙ্গলসিং—	আলোয়ারের মহারাজ
রামচন্দ্রজী—	ঐ দেওয়ান
ওকাকুরা—	জাপানী দূত
নুরমহম্মদ—	বিবেকানন্দের শিষ্য, পরে মহম্মদানন্দ
মহারাজা—	খেতুড়ীর মহারাজা
জগমোহন—	ঐ দেওয়ান
টমাস্—	ইংরেজ রেসিডেণ্ট্
মহেন্দ্র—	ইংলণ্ডে পাঠরত জনৈক ছাত্র (মহেন্দ্রনাথ দত্ত)
গুড্উইন—	ইংরেজ যুবক, স্বামীজির ষ্টেনোগ্রাফার
গিরধারীলাল—	গোরক্ষিণী সভার সম্পাদক
কেষ্টা—	সাঁওতাল শ্রমিক
ঋষি—	সপ্তর্ষি
ব্রহ্মচারীগণ—	

সতী—	
ভারতমাতা—	
সারদামণি—	শ্রীমা
ভুবনেশ্বরী—	নরেনের মাতা
মায়া—	সন্ন্যাসীর পালিতকন্যা
ক্ষান্তমণি—	কেবলরামের স্ত্রী
লছমীবাঈ—	বাঈজী
মার্গারেট—	বিবেকানন্দের শিষ্যা পরে নিবেদিতা।



প্রস্তাবনা

(মাইকে বলা হইবে ভিতর হইতে)

সম্ভবামী যুগে যুগে। ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য, ধরার পাপভার লাঘব করবার জন্য ধরার ধূলিকণার মাঝে নেমে আসতে হয় শ্রীভগবানকে। মানবদেহ ধারণ করে মানবকে উদ্ধার করবার জন্য তাই যুগে যুগে আসেন মহামানব। কিন্তু তাঁরা আসেন, সঙ্গে করে আনেন আর একজন পার্শ্বচরকে। আলোর দ্যুতিকে উপলব্ধি করতে হ'লে চাই অন্ধকার। অন্ধকারের মাঝেই তাই আলোর বিকাশ। তাই একজন ধর্ম্ম অন্যজন কর্ম্ম। ধর্ম্মকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে কর্ম্ম আপন কাজ করে যায়। এক বৃন্তে যেন দুটি ফুল।

লঙ্কার রাবণকে মুক্তি দিতে এলেন নবদুর্ব্বাদল শ্যামরূপী রামচন্দ্র। সঙ্গে ধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ। দ্বাপরে কংশ বধ করতে এলেন কৃষ্ণ বলরাম। খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতকে এক ধর্ম্মরাজ্য পাশে বেঁধে হ'ল মহাভারতের প্রতিষ্ঠা। কে ঐ মহাপুরুষ জগতের হিতে আত্মবিসর্জ্জন দিতে এলেন ; যূপকাষ্ঠে বদ্ধহয়ে যিনি উদার কণ্ঠে বল্‌লেন, —ওরা জানে না ওরা কি করছে, পিতঃ, ওদের তুমি ক্ষমা কর। এবারেও মহাপুরুষ যীশুখৃষ্টের সঙ্গে আছেন জন্ দি ব্যাপ্‌টিষ্ট্। রাজপুত্র পরেছে ছিন্নকন্থা, পথে পথে ঘুরে নির্ব্বান এনে দিলেন ভারতবাসীকে। কিন্তু তিনিও একা নন। তাঁরই অমরবাণী—

অহিংসার বাণী আসমুদ্রহিমাচলকে শোনালেন মহারাজ অশোক। চক্রলাঞ্ছিত পতাকা তোমায় প্রণাম। মেরেছে কলসির কণা তাই বলে কি প্রেম দিব না—এই বলে চণ্ডালকে আলিঙ্গন করলেন, মূর্ত্তিমান শয়তান জগাই মাধাইকে উদ্ধার করলেন—বাংলার ঘরে ঘরে প্রেমের বাঁশী বাজিয়ে তুললেন নদের দুলাল গৌর ও নিতাই। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ—পাণ্ডিত্ত্যের অভিমানশূন্য ব্রাহ্মণ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরে। মূর্খ্য জ্ঞান দিলেন পণ্ডিতকে, গৃহী দীক্ষা দিলেন সন্ন্যাসীকে।

কেমন করে কোটি কোটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত লোক উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে মানুষের মত—কেমন করে অকল্যাণের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে তারা? এযে তাঁর গুরুর আদেশ—এযে তাঁর অন্তরদেবতার নিগূঢ় নির্দ্দেশ—তাঁকে দিতে হ'বে লোকশিক্ষা—করতে হ'বে বিশ্বজনের কল্যাণসাধন। ধর্ম্মের নামে মন্দিরে চলে দেবতার পূজা। বাদ্যভাণ্ডে, নৃত্যগীতে, আমোদপ্রমোদে চলেছে মহা আড়ম্বর—কিন্তু দেবতা কোথায়? পুরোহিত ও সেবায়েৎসম্প্রদায়েয় স্বার্থপরতার বিষবাষ্পে দেবতা চলে গেছে অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসে। বিগ্রহের মধ্যে নেই প্রাণ—আছে কেবল তার বাহ্যিক রূপসজ্জা। ধর্ম্মের নামে চলেছে দিকে দিকে মানুষের নিদারুণ নিষ্পেষণ। কত সুবিধাবাদীর পুষ্টদেহে মেদবৃদ্ধি হচ্ছে, কিন্তু চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে শীর্ণমুখ—জীর্ণ শরীর, শতছিন্নবাস কত বুভূক্ষু দেবতার দ্বারে দ্বারে—কে চায় তাদের পানে? জীবের মধ্যে শীব কেঁদে বেড়াচ্ছেন পথে পথে—কে রাখে তাদের সন্ধান? প্রাণহীন পুতুল দেবতার মাঝে কে করবে প্রাণ-

প্রতিষ্ঠা ? অনাহারে, অনিদ্রায় রোদে পুড়ে জলে ভিজে গাছের তলায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে সহায়সম্বলহীন নিঃস্ব যে সব দেবতা—তাদের বুকে প্রাণ না জাগালে কি প্রাণ জাগতে পারে মন্দিরের ঐ বিগ্রহের মধ্যে। "বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর ? জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" কিন্তু কই সে ঈশ্বরের পূজা ? জীবকে মেরে শীবকে পূজা —এতো মর্ম্মান্তিক পরিহাস। কোথায় তিনি ? যেথায় চাষী করছে চাষ খাটছে বারমাস—সেইখানেই যে তাঁর স্থান। "দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমণাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ—" গীতার এই মহাবাণী অক্ষরে অক্ষরে নিজ জীবনে প্রতিফলিত করে কে ছুটেছে আর্ত্ত মানবের কল্যাণে ? নিজের বিশাল অন্তরে সকলের ঠাঁই করে দিয়ে নিজের স্থানের কথা ভাবে না—কবে কোথায় আর দেখা গেছে—এমন নিষ্কাম যোগী—মুক্তপুরুষ ?

আজও সেই জলদগম্ভীর উদাত্তকণ্ঠ ভেসে আসে—"হে ভারত, ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদর্শ—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ—সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর। ভুলিও না—তোমার বিবাহ—তোমার ধন—তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত—ভুলিও না—তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র। ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত—তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী—ভারতবাসী আমার ভাই। বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল

ভারতবাসী আমার ভাই, তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার প্রাণ—ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর—ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা—আমার যৌবনের উপবন—আমার বার্দ্ধক্যের বারানসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ—ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ—আর বল দিনরাত —হে গৌরিনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও। মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর—আমায় মানুষ কর।"

অন্ধকারের পরপারে এ কে উন্নত—উজ্জ্বল পুরুষ? ক্ষমা স্নেহ ও সমত্ববুদ্ধির ঔদার্য্য—কে এই মাধুর্য্যের অখণ্ড ভাণ্ডার? এ কে আনন্দঘন বিজ্ঞানঘন নির্লেপ নিরাময় পুরুষ—মালিন্যরহিত, শোক রহিত, জরারহিত, মৃত্যুরহিত আকাশাত্মা? কে এই বিবেকানন্দ? কে এই নরেন্দ্র? কে এই নরেন?

(মাইকে বলা শেষ এবং সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে দৃশ্য আরম্ভ)

—প্রথম অঙ্ক—

প্রথম দৃশ্য

(দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষ। ভক্তবৃন্দ সমাবৃত পরমহংসদেব। সময় সন্ধ্যা।)

রামকৃষ্ণ—কে এই নরেন? কে এই নরেন?

শশি—আপনি তো দেখছি নরেন নরেন করে পাগল হয়ে যাবেন। নরেন কদিনই বা এখানে এসেছে। এখনো তো আপনাকে ঠিকমত মেনে নিতে পারে নি।

কালী—আপনার শেষকালে না ভরতরাজার যো হয়। ভরতরাজা হরিণ ভাবতে ভাবতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন ব'লে পরজন্মে হরিণ জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছিল।

নিরঞ্জন—সত্যিই নরেনের জন্যে আপনার এত উতলা হওয়া উচিত নয়। ওতো সেদিনকার ছেলে, কিই বা ওর জ্ঞানবুদ্ধি।

গিরীশ—কাল কেশব সেন কি সুন্দরই না বক্তৃতা করলেন। কি গভীর তত্ত্বজ্ঞান।

রামকৃষ্ণ—কেশবের যদি একটা বড় শক্তি থাকে, নরেনের সে রকম আঠারটা শক্তি আছে। কেশবের মধ্যে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলছে আর নরেনের নধ্যে জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ পাচ্ছে। কারও সঙ্গে ওর তুলনা হয় না, ওযে খাপখোলা তলোয়ার।

হাজরা—তুমি দিনরাত এই সব ছোঁড়াদের ভাবনা ভাব, ভগবানকে ভাবকে কখন?

রামকৃষ্ণ—ওরে শালা, তুই আবার এই কথা বলছিস্ ? তোর একথা শুনে কাল মাকে বল্‌লুম—মা, হাজরা বলে নরেন আর এই সব ছেলেদের জন্য এত ভাবি কেন ? তাতে মা বললেন—তিনি সব মানুষে রয়েছেন, তবে শুদ্ধ আধারে তাঁর প্রকাশ বেশী।

গিরীশ—তাহলে ভজন-পূজন সব ছেড়ে দিয়ে এবার আমাদের কথাই ভাবতে থাকুন। মা-মা করে আর কি হ'বে ?

রামকৃষ্ণ—ওরে আমি দেখি তোরা সব সাক্ষাৎ নারায়ন। তুই শালা (গিরীশকে) তো ভৈরব। জানিস নরেনকে যখন প্রথম দেখি তখন ওর শরীরে হুঁস্ ছিল না। যেই ছুঁলুম অমনি বাহ্যজ্ঞান হারালো। তারপর থেকে ওকে দেখবার জন্য প্রাণের ভেতরে আকুলি বিকুলি করতো। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হতো যে মনে হতো বুকের ভেতরটা কে যেন গামছা নিংড়োবার মত জোর করে নিংড়াচ্ছে। তখন আর সামলাতে পারতুম না, ছুটে বাগানে চলে যেতুম—ঝাউতলায় যেখানে বড় একটা কেউ যায় না—সেইখানে গিয়ে চিৎকার করতুম—ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না রে। খানিকটা এই রকমে ডাকছেড়ে কাঁদলে তবে মনটা ঠাণ্ডা হতো। আর সব ছেলেরা যারা এখানে এসেছে তাদের কারও কারও জন্য কখন মন কেমন করেছে বটে কিন্তু নরেনের জন্যে যেমন হয়েছিল তার তুলনায় সে সব কিছুই নয়। একদিন কালী বাড়ীর খাজাঞ্চী ভোলানাথকে বললুম—হ্যাঁগা, আমার এমন হচ্ছে কেন ? ও কি বল্লে জানিস্ ?

শশী—ভোলানাথ তো হিসেবপত্র নিয়েই থাকে ও আবার কি বলবে ?

রামকৃষ্ণ—ও বললে, এর মানে মহাভারতে আছে। সমাধিস্থলোকের মন যখন নীচে আসে, সত্ত্বগুণী লোকের সঙ্গে বিলাস করে, সত্ত্বগুণী লোক দেখলে তবে তার মন ঠাণ্ডা হয়। এই সব শুনে তবে আমার মনে শান্তি হয়। তবু এখনও মাঝে মাঝে নরেনকে দেখতে না পেলে বসে বসে কাঁদি।

হাজরা—যত সব পাটোয়ারী বুদ্ধি।

বাবুরাম—আমরা তো দেখেছি আপনি অনেক সময় যার তার হাতে জল খান না, যার তার দেওয়া খাবার খান না। জিজ্ঞেস করলে বলেন ঐ লোকগুলি বিশুদ্ধ চরিত্র নয়। কিন্তু নরেন সকলের হাতে খায় তো বটেই আবার খাদ্যাখাদ্যের কোন বাচবিচার নেই। নিষিদ্ধপশুপক্ষীও খায়।

রামকৃষ্ণ—ও হচ্ছে আগুন, ওর স্পর্শে পাপতাপ সব পুড়ে খাক্ হয়। ও যদি শোরগরুও খায় কোন দোষ হবে না।

শরৎ—ওর তাহলে কোন কাজেই দোষ হবে না ?

রামকৃষ্ণ—ওরে হিংসে করিস্ না। মা, মা, নরেন কে এরা জানে না। [আজ প্রথমেই তোমাদের বলতে চেয়েছিলুম—কে এই নরেন ? (মঞ্চ ঘুরিয়া গেলে কিংবা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ না হইলে পর্দ্দার অন্তরালে দেখা যাইবে—সাতজন ঋষি গোল হইয়া বসিয়া বেদমন্ত্র পাঠ করিতেছেন—মাঝখানে একটি গ্লোব—বিশ্বের প্রতীক। মাইকে বৈদিক সুর দেওয়া হইবে সমবেত-কণ্ঠে ও যন্ত্রসঙ্গীতে। হঠাৎ গ্লোবটি বিদীর্ণ হইবে, তাহার মধ্য

হইতে ভারতমাতার আবির্ভাব, হস্তে একটি নবজাত শিশু। তিনি বললেন—হে ঋষিগণ, গ্রহণ কর এই শিশু। মানবের মঙ্গল হবে, ভারতের মঙ্গল হবে। ইনিই স্বয়ং শীব-শঙ্কর-মহাদেব। জয়স্তু! একজন ঋষি শিশুকে গ্রহণ করিলেন।)]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(কলিকাতা ময়দানের নিকটবর্ত্তী পথ। ফুটবল খেলা ভাঙ্গিবার পর খেলা দেখিয়া দলে দলে লোক ফিরিতেছে।)

বলাই—আরে রেখে দে তোদের টাউন ক্লাব। গোরাদের হারান কি সহজ কথা—না তা ভেতো বাঙ্গালীর পক্ষে সম্ভব?

রমেশ—তোর হাইলাণ্ডার পল্টনই বা কখানা গোল দিতে পারলে? তবু তো রেফারী ছিল মেজর রবিন্সন্। তারমানে লালমুখোরা খেলেছে বারজনে।

বলাই—দেখ্, বাজে কথা বলিস্ না। রবিন্সনের মত রেফারী কটা জন্মেছে? আর গোরাদের কথা বলছিস্? ওদের বুটের কাছে কজন এগুতে পারে?

রমেশ—কেন এদিকে চাইনিস্ওয়ালের মত টাউনের ব্যাক নরেন দত্তকে কাটিয়ে কটা গোরা গোলের কাছে যেতে পারছিল? আর বুটের কথা বলছিস্, শোভাবাজারের অনেকেই আজ-কাল বুট পরছে।

বলাই—তা যাই বলিস্ ভাই, হাইলাণ্ডারদের খেলা একটা দেখবার মত। আহা কি লং পাস্। আর কি ড্রিব্লিং। আর ও রকম হাই সট্ একটা বাঙ্গালী ছেলে পারবে?

রমেশ—টাউন ক্লাবে যদি নরেন দত্তের মত ফরোয়ার্ডে একটা প্লেয়ারও থাকতো তো আজ গোরা পল্টনদের জারিজুরি বেরিয়ে যেত। বাছাধনদের কত ধানে কত চাল বোঝা যেত।

বলাই—সে তুই যাই বলিস্ ব্রাদার, এই সব সাবুখাওয়ামার্কা ছেলেগুণো কখনও সাহেবদের সঙ্গে পারে? আরে সাহেবরা যে জেতে নি সে তো স্রেফ্ দয়া করে। হ্যাঁ বাবা, সাহেবরা যদি একটু মাথা ঘামিয়ে খেলতো তো সব একেবারে সাফ্ হয়ে যেত। যত সব! আরে সাহেবদের সঙ্গে খেলতে এসেছে যত সব সরুচাক্‌লীর মত প্লেয়ার।

(নেপথ্যে কয়েকজন গোরা সৈন্যের "হুররে হুররে" করিয়া মাতলামীর আওয়াজ আসিতে লাগিল। বলাই ভীতভাবে এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিল)

রমেশ—কি হে বীরবর, ভয় পেয়ে গেলে নাকি? এই মাত্রতো গোরাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলে।

বলাই—এ কি রে বাবা! কতকগুণো মাতাল গোরা এইদিকেই আসছে। কি করি, কোনদিকেই যাই? এদিকে, ওরে বাবা—এদিকেই আসছে। ওদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে আর লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। ওরে বাবারে (প্রস্থান)

রমেশ—এই বলাই দাঁড়া, দাঁড়া, আমাকে একলা ফেলে পালাস্‌নি (প্রস্থান)

(অন্যদিক দিয়া নরেনের প্রবেশ—মালকোচামারা গুটিয়ে ছোট করে কাপড় পরা, গায়ে সাণ্ডো গেঞ্জি—ঘামে ভেজা—যেন খেলাভাঙ্গার পর রাগান্বিত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। তাহার

ঠিক পিছনে ব্যস্তভাবে টাউনক্লাবের সম্পাদক হেমেন্দ্র বোস)

হেমেন্দ্র—আরে নরেন, একি ব্যাপার, তুমি রাগ করে চলে আসছো কেন ?

নরেন—চলে আসবো না তো কি করবো ? তোমরা এই টাউন ক্লাবের কর্ত্তারা, কি করতে ঐ হাইল্যাণ্ডারদের ডেকে নিয়ে এসে জামাই আদরে মদ খাওয়াচ্ছো ?

হেমেন্দ্র—আহা আহা, তুমি চটছো কেন ? আজ তো আমাদের আনন্দ করবারই কথা। অতবড় মিলিটারী টিমের সঙ্গে ড্র করা কি সহজ কথা ?

নরেন—ড্র করাতেই আনন্দ ! আজ যদি আমাদের ফরোয়ার্ডরা গোরাদের বুট দেখে ভয় না পেয়ে সাহস করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতো দেখে নিতুম কতবড় টিম্। তাই বলে কি ওদের আদর করে—

হেমেন্দ্র—আহা, আহা, ভুলে যাচ্ছ কেন যে ওরা আমাদের আজ অতিথি—

নরেন—স্বীকার করলুম ওরা আমাদের অতিথি, কিন্তু তাই বলে এইরকমভাবে মদ খাওয়াতে হবে ? আমাদের গরীব দেশ, দুবেলা দুমুঠো ভাত জোটে না—আর আমাদের চাঁদার টাকায় তোমরা ওদের মদ খাওয়াচ্ছ ?

হেমেন্দ্র—সত্যি ভাই আমি অতটা ভাবিনি। আমারই অন্যায় হয়ে গেছে। আর তো কোন উপায় নেই। ওরা বোধ হয় এতক্ষণ মদ খেয়ে চলে গেছে। তুমি এসো আমার সঙ্গে, তোমাকে জলটল না খাইয়ে আমি কিছুতেই ছেড়ে দেব না। তোমাকে

আমি আমার ল্যাঙোকরে বাড়ী পৌঁছে দেব। এস ভাই। (হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। অন্যদিক দিয়া কেবলরামের প্রবেশ। তাহার বেশভূষা পল্লীগ্রামের মত। ধুতিটা ছোট ও ময়লা—ফুলসার্ট ফর্সা। হাতে একটা কাপড়ের পুঁটলী। সে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে প্রবেশ করিল)

কেবলরাম—এ আমি কুনে আইলাম। অন্ধকার হইসে—এহন কুনে যামু? (অন্যদিক দিয়া দুইজন মাতাল গোরা সৈন্যের প্রবেশ।)

১নং—হুররে। হুররে। Who is there?

২নং—(তাহাকে ধরিয়া) এই টুমি কোন আছে?

কেবলরাম—আমি কেবলরাম। ক্যানারামের ছ্যাওয়াল, ব্যাচারামের পৌত্র, নিধিরামের প্রপৌত্র, ধনাকেষ্টর বৃদ্ধপ্রপৌত্র—আমি ক্যাবলরাম।

১নং—What, কেবল "র‍্যাম্"। হামি whisky খাইয়াছে পেট ভরিয়া—

২নং—এবার "র‍্যাম" খাইতে হবে। Let us drink Ram

(১নং তাহাকে ধরিল)

কেবলরাম—ম্যাইরা ফেলসে। ম্যাইরা ফেলসে—(২নং তাহার কাপড়ের পুঁটলীটি কাড়িয়া লইল।)

২নং—What a nice idea? Let us play this foot ball.

১নং—No no—হইা বহুট্ বড়া আছে। ইহা Foot ball হইবে না—ইহা রাগবী হইবে।

২নং—ড্যাম্ your রাগবী। Let me kick it (পুঁটলীতে লাথি মারিল)

১নং—(নাচিতে নাচিতে কেবলরামের মাথায় চাঁটি মারিতে মারিতে) Beat and drink, beat and drink.

কেবলরাম—মইরা গেলাম, কে কুথায় আছ রক্ষা কর। একেবারে মাইরা ফেলাইল—রক্ষা কর (বেগে নরেনের প্রবেশ)

নরেন—দাঁড়াও। একি অত্যাচার! At once leave this man or I shall kick you out. (গোরা সৈন্যদের ভয়ে প্রস্থান) কে তুমি জানি না, কিন্তু যেই হও, তুমি বাঙ্গালী—তুমি ভারতবাসী। বিদেশীর কাছে এমনি করে কি চিরদিনই মার খাবে? যেটুকু তোমাব শক্তি আছে সেটুকুও কি সাহসকরে কাজে লাগাতে পার না? একবার যদি সাহস করে বুব ফুলিয়ে দাঁড়াতে, কি সাহস ছিল ঐ মদ্যপায়ী গোরাদুটো আমোদের নামে এমনি করে তোমার ওপর অত্যাচার করে? ওঠো, জাগো, ভীরুর মত আর পড়ে থেকো না।

কেবলরাম—আমাগো ডাহার নাগমশাই কইলেন কলকাতায় সাক্ষাৎ বগবান্ আছেন গঙ্গার তীরে। তাই দেখবার লাইগ্যা এহানে আইলাম। বগবানকে দেখতে পাইলাম না, তাতে দুঃখ নাই। তোমারে দেখছি—তুমি একটা প্রণাম লও ঠ্যাবত (প্রণাম করিল।)

তৃতীয় দৃশ্য

(দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কক্ষ। একটা চৌকিতে রামকৃষ

বসিয়া আছেন। সারদামণি দাঁড়াইয়া আছেন। সময় অপরাহ্ন।)

[রামকৃষ্ণ—দেখ, আজ রাতে আমার পূজোর সব ব্যবস্থা ঠিক থাকে যেন।

সারদা—পূজোর ব্যবস্থা কবেই বা ঠিক থাকে না।

রামকৃষ্ণ—আরে না না, আজ তো অন্যদিনের মত পূজো হবে না। আজ যে আমি ভগবতীর পূজো করবো।

সারদা—মা কালীকে ছেড়ে ভগবতীর পূজো ?

রামকৃষ্ণ—হাঁ, ভগবতীর পূজো করবো—অর্থাৎ তোমাকেই সামনে বসিয়ে পূজো করবো।

সারদা—এ তুমি কি বলছো ? আমি স্ত্রী—দাসানুদাসী।

রামকৃষ্ণ—তুমি তো অবিদ্যা নও—তুমি যে স্বয়ং ভগবতী। তুমি তো জান প্রত্যেক স্ত্রীলোকই আমার মা—আমার কাছে স্ত্রী কন্যার কোনই প্রভেদ নেই—সবাই আমার মা—আমার জগদম্বা।

সারদা—কিন্তু—

রামকৃষ্ণ—না না, এতে কিন্তু নেই। তুমি তো দেখছো নরেন, শশি, কালী ওরা সবাই মা বলতে অজ্ঞান। এমন একদিন আসবে যখন বাংলার ঘরে ঘরে তোমার পূজো হ'বে—বাঙ্গালী মা বলতে অজ্ঞান হ'বে। আজ আমি তারই সূচনা করবো।

সারদা—আমি তো তোমার কোনো কাজেই বাধা দি না। তুমি যদি মনে কর এতে ভাল হ'বে তাহলে আমার কোন আপত্তি হ'তে পারে না। সে ক্ষেত্রে তোমার—আমার পরম গুরু—

আমার দেবতার পূজোও আমি গ্রহণ করবো। আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী—যেমনটি আমাকে চালাবে তেমনটি আমি চল্‌বো।

রামকৃষ্ণ—ভালকথা, তোমায় বলতে ভুলে গেছি, আজ নরেন আর গিরীশ এখানে খাবে। ওদের জন্যে রুটি আর ছোলার ডাল কোর। নরেন আবার ছোলার ডাল খেতে বড় ভালবাসে। তবে বেশী খেতে দিও না। চারখানা করে রুটি দিও, বেশী খাওয়া ঠিক নয়—ওতে শরীর ও মন দুয়েরই ক্ষতি হয়। তোমার তো আবার হুঁস থাকে না।

সারদা—দেখো, ওদিকটা তোমার নজর না দিলেও চলবে। আমি মা—আমার ছেলেরা কে কত খাবে তা আমি ভালই বুঝবো।

রামকৃষ্ণ—এই তো চাই। তোমার ছেলেদের ভার তুমি নিলেই আমি নিশ্চিন্ত। নরেনকে নিয়ে হয়েছে জ্বালা। ওতো কেবল বলে, আমাকে কি করে সমাধিস্থ হওয়া যায় তাই শিখিয়ে দাও। আরে ও যে শক্ত আধার, ও যদি সমাধিস্থ হয় তাহলে যে জগতের অন্য কোন কাজই হ'বে না।

সারদা—ও কি তাহ'লে সন্ন্যাস নেবে না—আমার তো মনে হয় ও তোমার পরম ভক্ত।

রামকৃষ্ণ—সে কথা ঠিক। সন্ন্যাস ও নেবে। তবে ভক্তিযোগ ওর জন্যে নয়—ওর জন্যে কর্ম্মযোগ। তাই তো মাকে বারবার বলি—মা, ওকে মায়ায় ঘিরে রাখ, না হ'লে ও যে সাধনার শ্রেষ্ঠমার্গে চলে যাবে—সমাধী লাভ করবে কিন্তু তাতে জগতের কোন কাজই হ'বে না।

সারদা—তাহলে আমি এখন যাই। গোলাপমার বোধহয় এতক্ষণ কুটনো কোটা হয়ে গেছে। এবার গিয়ে রান্না চাপাতে হবে। (প্রস্থান)]

রামকৃষ্ণ—আমি যাই। মাকে নরেনের জন্য একটু বলতে হবে। ওর মনে এখনও একটু দ্বিধার ভাব রয়েছে। মা মা ভবতারিণী। "মা আমায় ঘোরাবি কত ?" (গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান। একটু পরে দেখা গেল একজন লোক একটা কাল কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া চুপি চুপি চোরের মত প্রবেশ কারয়া খাটের নিকট কিছু একটা করিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। মঞ্চ অন্ধকার থাকিবে এবং কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত্ত মূর্ত্তির উপর একটা ফোকাস্। লোকটি প্রস্থান করিলে আলো জ্বলিবে এবং কথা বলিতে বলিতে নরেন এবং অন্যান্য শিষ্যগণের প্রবেশ।)

গিরীশ—পরশু রাতের ঘটনা তোমায় বলি শরৎ। নরেন বললে—চলো জিসি আজ আমরা বাগানে গাছের তলায় বসে ধ্যান করি। কিন্তু অসংখ্য বড় বড় মশার উপদ্রবে ওখানে কি এক পলকও চোখ বোজবার জো আছে ? কালো কালো মশা, যেখানে কামড়ায় সেখানটাই ফুলে ওঠে—অসহ্য জ্বালা করে।

শরৎ—সে তো আমরাও জানি।

গিরীশ—তারপর কি হল শোনই না। অনেকক্ষণ ধরে বিপুল চেষ্টা করেও কোনমতেই পারলুম না ধ্যানে নিমগ্ন হ'তে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকি—আবার তীব্র দংশনের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠি। শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে গায়ের এদিকে

সেদিকে চড় চাপড় মারতে থাকি। হঠাৎ একবার চোখ খুলে দেখি—নরেন বসে আছে অচল, অনড়, স্থির—তুই চোখ ওর নিমীলিত। সর্ব্বাঙ্গ ওর কালো রংএর কম্বলে মোড়া।

নিরঞ্জন—কম্বল মুড়ি দিয়ে ধ্যান করছিল—তা নরেনের বুদ্ধি আছে।

গিরীশ—আরে কম্বল নয়। কম্বল নয়। কালো কালো অসংখ্য মশা ওর গায়ে এমনি ঘন হয়ে বসেছিল যে মনে হচ্ছিল যেন কম্বল গায়ে দিয়ে আছে।

রাখাল—তারপর কি হ'ল? তুমি নিশ্চয়ই মশাগুনো তাড়িয়ে দিলে?

গিরীশ—আরে মশা কি তাড়ালেই যায়। ওরাওতো ঠাকুরের ভক্ত—ওদেরও নেশা হয়েছে—তাড়ালে যাবে কেন? যাক্, ধ্যান ছেড়ে আমি তো নরেনকে বারবার ডাকতে লাগলুম। কিন্তু ওকি আর তখন বাহ্য জগতে আছে? শেষে পা ধরে টানা-টানি করেও ওর চৈতন্য আনতে পারলুম না। শেষকালে নরেনের সংজ্ঞাহীন দেহ ধ্যানের আসন থেকে লুটিয়ে পড়লো—সর্ব্বাঙ্গ তখন ওর মড়ার মত শক্ত হয়ে উঠেছে। (ভাবাবেগে নরেনের দিকে চাহিয়া) আমরা নয়—আমরা নয়—তুইই পারবি, তুইই পারবি। আমাদের যা কল্পনাতেও আসে না, তোর পক্ষে তা সহজসাধ্যই বটে।

নরেন—কি যে বল জিসি? ঠাকুর বলেন তুমি লোকশিক্ষা দিচ্ছো, তুমি তো মস্ত কাজ করছো। আমি আর কি করতে পারলুম?

গিরীশ—ওসব লোকশিক্ষা ফিক্ষা বুঝি না ভাই। তুচারখানা নাটক

লিখি এবং তাতে অভিনয়ও করে থাকি। তাতেই আমার পেট চলে।

নরেন—ভাবছি একদিন তোমার অভিনয় দেখতে যাবো।

গিরীশ—বেশ তো, কালই চলো না। ঠাকুরও যাবেন বলছিলেন।

বাবুরাম—কিন্তু ঠাকুর গেলেন কোথায়? তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

শরৎ—তিনি তো কালীঘরে। (এই সময় রামকৃষ্ণের—'মা, মা, ভবতারিণী মা আমার'—বলিতে বলিতে প্রবেশ। তিনি আসিয়া নিজের চৌকিতে বসিয়াই অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলেন।)

রামকৃষ্ণ—উঃ, উঃ, মরে গেলুম। (সকলে ছুটিয়া বিছানার নিকটে গেলেন—রামকৃষ্ণকে কিছুতে দংশন করিয়াছে মনে করিয়া। তাহারা সকলে বিছানা ঝাড়িতে তাহার মধ্য হইতে একটি টাকা টং করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। নরেন মস্তক অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।) বেশ করেছিস্, বেশ করেছিস্। মনে সন্দেহ হলে বাজিয়ে নিবি বই কি। বাগানের মালী দেখেই কি চলে আসতে আছে—মালিকের সন্ধান করবি—চরৈবেতি বলে আরও এগিয়ে যাবি।

নরেন—দেখুন, কাল দেখলুম আপনি গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে এক হাতে টাকা আর এক হাতে মাটির ঢেলা নিয়ে—টাকা মাটি, মাটি টাকা—বলছেন। শেষপর্য্যন্ত টাকা ও মাটি তুইই জলে ফেলে দিলেন। তাই আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। (পদ ধারন)

রামকৃষ্ণ—না না তুই ঠিকই করেছিস্, মনে সন্দেহ পুষে রাখতে নেই।

নরেন—আপনি বোধহয় জানেন না, আমি ছোটবেলা থেকে শুধু লোকের কথায় বিশ্বাস করতে পারি না যতক্ষণ না আমি নিজে যাচিয়ে নিই। (একটু পরে) আচ্ছা ঠাকুর আপনি ভগবানকে দেখেছেন ? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম কিন্তু তিনি সে কথার উত্তর না দিয়ে অন্য কথায় মোড় ঘুরিয়েদিলেন।

রামকৃষ্ণ—ঠিক যেমনি তোকে দেখছি তেমনি তাকেও দেখি, তার সঙ্গে কথা কই।

নরেন—আমাকে দেখাতে পারেন ?

রামকৃষ্ণ—নিশ্চয় পারি। যা সোজা কালীঘরে চলে যা, মার কাছে একটা চাকরী বাকরী চেয়ে নে। তোর বাপ মারা যেতে বড্ড কষ্টে আছিস্।

নরেন—আমি বল্‌লে কি হবে ?

রামকৃষ্ণ—কেন হবে না ? তুই চেয়েই দেখ না। (নরেনের প্রস্থান) গিরীশ, তোকে বলেছিলুম রোজ একবার করে মার নাম করতে। তার কতদূর কি হ'ল ?

গিরীশ—আমার সময় কোথায় ? থিয়েটার করবো, না নাটক লিখবো, না তোমার মার নাম করবো ? ওসব আমার দ্বারা হ'বে না।

রামকৃষ্ণ—সে কি রে, সারা দিনরাতের মধ্যে একবারও মার নাম করবার তোর সময় হ'বে না ?

গিরীশ—আজ্ঞে না আমার অত সময় নেই।

রামকৃষ্ণ—বেশ, তবে আমি তোর হ'য়ে মাকে ডাকবো। তুই আমায় বকলমা দিয়ে দে।

রাখাল—গিরীশ, এটা তোর বাড়াবাড়ী ভাই।

শরৎ—তোমার জন্যে ঠাকুরকে রোজ মাকে ডাকতে হবে?

রামকৃষ্ণ—সবই মার ইচ্ছে। (নতমস্তকে নরেনের প্রবেশ) কিরে, মাথা নীচু করে আসছিস্ কেন? মার কাছে চাইলি?

নরেন—পারলুম না।

রামকৃষ্ণ—সে কি রে, চাইলি না।

নরেন—মার কাছে লাউকুমড়ো চাইতে পারলুম না! প্রার্থনা করলুম—মা, আমায় ভক্তি দে, বৈরাগ্য দে, বিবেক দে।

রামকৃষ্ণ—ঠিক বলেছিস্, তুই যে বুদ্ধিমান। তোর ভক্তি হবে, বৈরাগ্য হ'বে আর বিবেক—হাঁ, সে তো হবেই। মার ইচ্ছেয় আজ থেকে মোটা ভাত কাপড়ের অভাব তোদের সংসারে হবে না। যাক্ তুই একখানা গান শোনা। ওরে তোর গান অনেকদিন শুনিনি, গান গা। (নরেন তানপুরা লইয়া গান ধরিল।)

(গান)

জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী।
(তুমি) ব্রহ্মানন্দ স্বরূপিনী।
(তুমি) নিত্যানন্দ স্বরূপিনী,
প্রসুপ্ত ভুজগাকারা, আধার পদ্মবাসিনী।

(গানের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ ভাবস্থ হইতে লাগিলেন—ক্রমে

মর্ম্মরমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হইলেন। শিষ্যমণ্ডলী ব্যস্ত হইয়া পড়িল।)

বাবুরাম—ঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে।

শরৎ—ঠিক ঠিক, তুমি দৌড়ে একজন ডাক্তার ডাকবার ব্যবস্থা কর।

গিরীশ—দেখি। আমাকে দেখতে দাও। বরং একটু জল নিয়ে এসো।

নরেন—জল আনবার দরকার নেই। ঠাকুর অজ্ঞান হ'ন নি—ওঁর ভাব হয়েছে। আবার গান শুনতে শুনতেই জ্ঞান হ'বে। (আবার গান ধরিল)

(গান)

যশোদা নাচাতো তোরে ব'লে নীলমণি।
সে রূপ লুকালি কোথা করাল-বদনী শ্যামা।
[গগনে বেলা বাড়িত,
রাণী কেঁদে আকুল হ'ত
একবার তেম্‌নি তেম্‌নি ক'রে নাচ দেখি মা ॥]
বামে তাথেইয়া তাথেইয়া—
থিয়া থিয়া থিয়া বাজিত নূপুর—ধ্বনি,
সে বেশ লুকালি কোথা করাল বদনী (শ্যামা)
[শ্রীদামাদি সঙ্গে নাচতিস্‌ মা রঙ্গে
চরণে চরণ দিয়ে একবার নাচ্‌ দেখিমা ;
অসি ছেড়ে, বাঁশী নিয়ে একবার নাচ্‌ দেখি মা ;
মুক্তমালা ফেলে, বনমালা গলায় দিয়ে
একবার নাচ্‌ দেখি মা করাল বদনী শ্যামা ॥]

(গান শেষ হইলে ঠাকুর ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মিলন করিলেন।)

রামকৃষ্ণ—মা, মা গো করুণাময়ী। নরেন বেশ গায়। দেখ্ তুই বড্ড পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিস্, একটু কিছু খা। (এই বলিয়া নিজেই একখানি রেকাবী করিয়া কিছু মিষ্টি আনিয়া আপন হস্তে তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন।)

নরেন—(লজ্জিতভাবে) এ আপনি কি করছেন! ওরা সব খাবে না?

রামকৃষ্ণ—খাবে খাবে, তুই এটা খেয়ে নে। তোর মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে। বোধহয় বাড়ী থেকে কিছু খেয়ে আসিস্ নি।

গিরীশ—খেয়ে নাও ভাই খেয়ে নাও। আজ তোমার ভাগ্য ভাল। জানোনাতো সেদিন ঠাকুর আমার বাড়ীতে গিয়ে আমায় নিজের হাতে খাইয়ে এসেছিলেন।

রামকৃষ্ণ—দেখ্ নরেন, কাল রামদত্ত একখানা গরদের থান আর একথালা মিছরি পাঠিয়েছে। তুই নিয়ে যা তোর মার জন্যে। তোর মার পূজোর কাপড়খানা ছিঁড়ে গেছে।

নরেন—(রাগতভাবে) কি আমি ভিক্ষে নেব? আমার মার কাপড় ছিঁড়ে গেছে আমি কি আপনাকে বলতে গিয়েছিলুম?

রামকৃষ্ণ—ঠিক্ ঠিক্, তুই ভিক্ষে চাইবি কেন? তোর জন্ম শুধু দেবার জন্যে, নেবার জন্যে নয়। আর তাছাড়া তোকে ভিক্ষে দেব সে স্পর্দ্ধা আমার নেই। শোন্ তোরা, নরেনের ছোট-বেলার একটা গল্প বলি—ও কেমন অম্লানবদনে নিজের পরনের কাপড়খানা দান করে ফেললো।

(মঞ্চ ঘুরিয়া গেল)

দৃশ্যান্তর

(খুব ব্যস্তভাবে ভুবনেশ্বরীর প্রবেশ। তিনি স্নান করিতে যাইতেছিলেন। হা'তে একখানা গামছা। এক পাশে একটি তুলসী মঞ্চ।)

ভুবনেশ্বরী—বিলে, বিলে, কোথায় গেল সে হতভাগা ? আঃ, কি দস্যি ছেলেই না হয়েছে ! বিলে, বিলে, (চারিদিকে দেখিয়া) দেখেছো, একেবারে আঁস্তাকুড়ের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শিগ্‌গির আয় বলছি, মেরে হাড় ভেঙ্গে দোব। তবু আসে না। (একটুপরে) আয়, সোনা আমার মানিক আমার, তোর জন্যে আজ ক্ষীরপুলি করেছি। নাঃ, তবুও আসছে না। দেখ্‌ বিলে। যদি কথা না শুনিস্‌ তবে শিবঠাকুর তোকে কৈলাসে নিয়ে যাবে না। (বালক নরেনের প্রবেশ, হস্তে একটা চাবুক) কি করছিলি আঁস্তাকুড়ের মাঝে ?

নরেন—জান মা, আমাদের সহিস্‌ কি বলেছে ?

ভুবনেশ্বরী—কি বলেছে বাবা ?

নরেন—বলছিলো—সংসারে বড় ঝামেলা, কি কুক্ষণেই যে বিয়ে করেছিলুল। বিয়ে থেকেই সংসার, আর তার থেকেই যত দুঃখ, যত ঝকমারি। তাই আমি ভাবলুম—রামসীতার যত দুঃখ সব এই বিয়ে হয়েছিল বলে। যারা জেনে শুনে দুঃখ পাবার জন্যে বিয়ে করে তাদের ভালবাসতে পারবো না—তাদের পূজো করতে পারবো না। তাই রামসীতাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছি। আমার শিবই ভাল। কেমন জটা মাথায়—একলা একলা ঘুরে বেড়ায়। আমি কিন্তু মা, কিছুতেই বিয়ে করছি না।

ভুবনেশ্বরী—তা তো বুঝলুম, কিন্তু চাবুক দিয়ে কি করবি ?

নরেন—ও তুমি বুঝি জান না। আমি যে কোচুয়ান হব। কেমন মজা করে চাবুক মেরে ঘোড়ারগাড়ী চালাবো। (নেপথ্যে গান শোনা গেল) দাঁড়াও দাঁড়াও, সেই সন্ন্যাসী এসেছে, আমি ওদের ধরে আনছি, তুমি যেয়ো না যেন। (নরেনের প্রস্থান ও একজন সন্ন্যাসী ও একটি বালিকাকে লইয়া প্রবেশ)

(গান)

সন্ন্যাসী ও মহামায়া—এল তোর খ্যাপা দিগম্বর,
ওকে রাখিস্ ধরে, যতন করে,
নইলে পরে যাবে চলে
ওযে তোর ভোলামহেশ্বর।
নাচে বাহুতুলে, ভোলা ভাবে ভুলে,
ববম্ ববম্ গালে বাজে
শশাঙ্ক সুন্দর সাজে
রজত ভূধর, নিন্দি কলেবর,
এল তোর খ্যাপা দিগম্বর।

নরেন—সন্ন্যাসী-ঠাকুর বেশ গান গাইতে পারে। [illegible] আমিও গান গাইবো। (মেয়েটির প্রতি) তোমার নাম কি গা ?

মহামায়া—আমার নাম ? ওমা তাও জানো না ? আমি যে মহামায়া।

নরেন—মহামায়া ! বড্ড বড় নাম। আমি বাপু তোমাকে ডাকবো মায়া বলে।

মহামায়া—মায়া, মায়া, হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ, বেশ বলেছো, মায়া। তা হাঁ রাজাবাবু, তোমার হাতে চাবুক কেন?

ভুবনেশ্বরী—তোমার রাজাবাবু যে সহিস্ হবে তাই, চাবুক মেরে ঘোড়া ছোটাবে।

সন্ন্যাসী—তা বেশ বলেছো—চাবুক মেরে ঘোড়া ছোটাবে। কিসের চাবুক্? না, চেতনার চাবুক। ঘোড়া তুটো কে কে—না ধর্ম্ম আর কর্ম্ম। আর গাড়ী? গাড়ী হচ্ছে আমাদের এই অলস দেশ। তুমি কিছু ভেবো না মা, তোমার ছেলে স্বয়ং শিব।

ভুবনেশ্বরী—সে কি, তুমি কেমন করে জানলে? আমি তো কাউকে বলি নি। বীরেশ্বর শিবের মানত করে ওকে পেয়েছি। জান ঠাকুর, ও হবার আগে আমি স্বপ্ন দেখি যে স্বয়ং বীরেশ্বর আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি ভিক্ষে নিয়ে আসছি। দ্রুত যাইতে ভুল করিয়া গামছা-খানি ফেলিয়া গেলেন।)

মহামায়া—রাজাবাবু, হাঁ করে কি দেখছো? সন্ন্যাসীর কাপড় ছিঁড়ে গেছে দেখতে পাচ্ছো না? ওকে একখানা কাপড় দাও না।

নরেন—কাপড়! কাপড় কোথাই পাই? এই নাও, আমার কাপড়-খানাই নাও। (তাড়াতাড়ী গামছাখানি পরিয়া নিজের কাপড়খানা খুলিয়া সন্ন্যাসীকে দিলে সন্ন্যাসী তাহা পরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ছোট বলিয়া তাহা পরিতে না পারিয়া মাথায় পাগড়ী করিল)

সন্ন্যাসী—বেশ, বেশ, এ কাপড় আমি মাথায় করে নিলুম।

চতুর্থ দৃশ্য

[(মঞ্চে গিরীশচন্দ্রের "দক্ষ যজ্ঞ" অভিনয় হইতেছে। মহাদেব ও সতী।)

মহাদেব—সত্যি, নিত্য সুধাই তোমায়,
ছাড়িবে না কভু মোরে ?
নিত্য কহ "ছাড়িব না।"
তবু মন নাহি বুঝে ;
আজি ছেড়ে যেতে চাও—
কেন পাগলে কাঁদাও ?
গেলে তুমি আসিবে না আর।

সতী—কেন নাথ ?
তোমা ছেড়ে রহিতে কি পারি ?
যজ্ঞ হেরি আসিব ফিরিয়া
অন্য কেন ভাব, প্রভু ?
যাই নাথ, কর না নিষেধ।

মহাদেব—যাবে যদি কি হেতু সুধাও মোরে ?
কর যে বা অভিরুচি।

সতী—প্রভু, নাহি কর রোষ,
মানা নাহি কর যজ্ঞে যেতে,
বল "যাও যজ্ঞালয়ে"।

মহাদেব—কহি তোরে,
অন্তর শিহরে যজ্ঞ কথা মনে হ'লে,
পতি-—অপমানে নিশ্চয় ত্যজিবে প্রাণ।

সতী—প্রভু, প্রাণ মম কঠিন পাষাণ হতে,

নহে, ত্রিসংসারে তব অপমান
ছার প্রাণ এখনও রেখেছি ?
সতী নাম কেন দিল মাতা ?
পতিভক্তি এই কি আমার ?
যজ্ঞে যেতে মানা নাহি কর মোরে।
যদি তব পদে থাকে মতি,
দেখিব কেমনে,
ত্রিসংসার মিলি, হরে করে অপমান।

মহাদেব—সতী, যেতে নাহি দিব তোরে।

সতী—কহি সত্য,
অন্নজল ত্যজিব কৈলাসে।

মহাদেব—অন্ন-পানি খাও বা না খাও,
কোন মতে যাইতে না দিব।

সতী—শুন ভোলানাথ। মহাদ্বন্দ্ব হবে আজি।
যাব, হাসিমুখে করহ বিদায়।

মহাদেব—হাসিমুখ রাখ নাই তুমি।
ইচ্ছা যদি যাও।
আমি যাইতে না দিব।

সতী—নাথ,
ধরি পায় ক'র না নিষেধ।

মহাদেব—ইচ্ছা যাও, মোরে না শুধাও!
চ'লে যাই, হ'ল আসি ধ্যানের সময়। (গমনোদ্যত)
(সতীর অন্তর্দ্ধান ও কালী মূর্ত্তির আবির্ভাব।)

একি ভয়ঙ্করী করালবদনা,
লোলজিহ্বা রুধিরমগনা,
গলিত—রুধির মুণ্ডমালা গলে বিলম্বিত,
মহামুণ্ড করে, রক্তস্রোত ঝরে,
খড়্গাধারে ভাসে রক্তধারে ;
রক্তোৎপল দ্বিভূজ দক্ষিণে !
বিবসনা বিকটদশনা ত্রিনয়না ;
চন্দ্রখণ্ড শোভে ভালে !
কোথা যাব—কোথায় পলাব ? (পলায়নোদ্যত, তারামূর্ত্তির আবির্ভাব)

ত্রাহি ! ত্রাহি !
কেরে নবনীরদবরণী ?
ঊর্দ্ধজটা বিভূষিত ফণী,
লম্বোদরা বাঘাম্বরা ঘোরাননা !
পঞ্চ অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভালে,
অগ্নিক্ষরে ত্রিনয়নে,
নৃমুণ্ডমালিনী চতুর্ভূজা ;
মুণ্ড খড়্গ খর্পর কমলসাজে ;
রাখ পায়, সভয় মহেশ।
কোথা যাব ? কেমনে পলাব ? (পলায়নোদ্যত, ষোড়শী-মূর্ত্তির আবির্ভাব)

পঞ্চপ্রেত পরে কে বামা বিহরে ?
রক্তবর্ণা, ত্রিনয়না, শশিচূড়া ;

চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর
এলোকেশী ভয় বাসি হেরি ! (পলায়নোগ্যত, ভূবনেশ্বরী-
মূর্ত্তির আবির্ভাব)

অম্বুজ—আসনা, ত্রিনয়না,
রত্নরাজী বিভূষণা ;
রক্তবর্ণা,
চতুর্ভুজে পাশাঙ্কুশ বরাভয় !
কৃপা কর পাগল ভোলারে।
কোথা যাব কেমনে পলাব ? (পলায়নোগ্যত, ভৈরবীমূর্ত্তির
আবির্ভাব)

অক্ষমালা পুঁথি বরাভয়,
শোভিত মৃণাল চারিভূজে,
রক্তবর্ণ অমল কমলে,
মুণ্ডমালা দলদল দোলে,
মণিময় হার সনে !
এলোকেশী কে গো ভয়ঙ্করী ?
রাখ গো পাগল ভোলা ! (পলায়নোগ্যত, ছিন্নমস্তামূর্ত্তির
আবির্ভাব)

ছিন্নমস্তা, ত্রিধারে রুধির ক্ষরে ;
দুইধারে পিইছে যোগিনী,
উলঙ্গিনী ছিন্নমুখে রক্তখায় ;
চন্দ্রসূর্য্য বহ্নি ত্রিনয়নে।
শিশুশশি শিহরে কপালদেশে।

কে রে ভীমা রক্তোৎপল-কায়
বিপরীত রতি দলি পায়।
হরে ভয় দেখাও আসিয়ে ? (পলায়নোদ্যত, ধূমাবতীমূর্ত্তির আবির্ভাব)

ঘোর ধূমবর্ণা বৃদ্ধা কাকধ্বজ রথে,
বিস্তার বদনা, পতিহীনা,
ক্ষুধায় আকুল বিভীষণা ;
কুলাকরে, কাঁপে অন্য কর !
ত্রাহি, ত্রাহি—
রক্ষা কর দিগম্বরে ! (পলানোদ্যত, বগলামুখী মূর্ত্তি'র আবির্ভাব)

শশাঙ্ক—শেখরী, ত্রিনয়না,
রত্ন সিংহাসনে।
পীতবস্ত্রা, পীতবর্ণা কে রে বামা ?
কে রে ভয়ঙ্করী,
জিহ্বা ধরি অসুরে মুদগরে বধ ?
শঙ্কায় আকুল প্রাণে মোর। (পলায়নোদ্যত, মাতঙ্গীমূর্ত্তি'র আবির্ভাব)

রক্ত—পদ্ম—শ্যামা,
কর পদ্ম খড়্গাচর্ম্ম পাশাঙ্কুশ শোভে,
বিধুমৌলি ত্রিনেত্রা,
অনলক্ষরে তাহে !

রাখ হরে রাঙ্গা পায়। (পলায়নোদ্যত, মহালক্ষ্মীমূর্ত্তি'র আবির্ভাব)

স্বর্ণবর্ণানলিনী আসনা,
পদ্ম-দ্বয় বরাভয়-কর ;
চতুর্দ্দন্ত শ্বেত মণ্ডকরী ;
চারিদিকে রত্নঘট ধরি'
অমৃত বরষে শিরে,
হেরি অন্তর শিহরে,
অপাঙ্গে নেহার বামা !

(মাইকে) মহালক্ষ্মী—যার তরে একার্ণবে শক্তির সাধন,
তার কথা করি অযতন—
কোথা যাও মহেশ্বর ?

মহাদেব—সতী, সতী !
কবে তোরে করিয়াছি অযতন ? (মহালক্ষ্মীমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান)
একি কোথা বামা নলিনী-বাসিনী ?
সতী, সতী,
হায়, ফুটিয়ে না ফুটে আঁখি মোর ;
মায়া মোর কেমনে ছেদিব ?
মহামায়া আপনি করিছে ছল !
সতী, সতী—(বেগে প্রস্থান। দর্শকের আসন হইতে রামকৃষ্ণ ও তাঁহার পিছনে নরেনের বেগে মঞ্চে আরোহণ)

রামকৃষ্ণ—সতী, সতী—মা-মা—

নরেন—ঠাকুর, ঠাকুর, এ কি করছেন ? আমরা যে জিসির অভিনয়

দেখতে এসেছি। জিসি, জিসি, শীঘ্র এস, দেখো, ঠাকুর ভাবাবেগে ষ্টেজে উঠে পড়েছেন। দক্ষরূপে গিরীশচন্দ্রের প্রবেশ)

গিরীশ—অপমান পূর্ণমাত্রা হবে প্রতিশোধ।

আরে রে অবোধ—আরে রে ভাঙড়।

শূল লয়ে কর ভারিভুরি !

ভাব সংহারের ভার তব ?

সে দম্ভ ঘুচিবে,

সৃষ্টি রবে সংহার বিহনে। কে রে তোরা আমার 'দক্ষযজ্ঞ' নাশ করতে এসেছিস্ ? তোদের আমি গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেব। বেরো বলছি, বেরো—আমার ষ্টেজ্ থেকে দূর হয়ে যা।

নরেন—জিসি, তুমি কাকে কি বলছো ? তুমি কি চিনতে পারছো না ? স্বয়ং ঠাকুর পরমহংস এছেন।

গিরীশ—ওঃ, পরমহংস ! আবার শালার সঙ্গে চেলাও আছে। আজ দুবেটাকেই দূর করে দেব। বড্ড যে বলা হয় নরেনই শিব। দেখ্ আমি শিবকে কেমন অপমান করেছি। আমার যজ্ঞে সমস্ত দেবতার নিমন্ত্রণ হয়েছে—কেবল ঐ ভাঙড় শিবেরই হয় নি। শিব অধিকার কিবা ?

আছে ভূতগণ, আছে বৃদ্ধ বৃষ—

এই তো সম্বল তার।

অমঙ্গলকেতু সে ভাঙড়,

মৃত্যু হতে অমঙ্গল কিবা ?

লয় কর্ত্তা অনাচার সৃষ্টি তার।
দেবদেব নাম—
ভ্রান্তজীব না ক'রে বিচার।
স্বেচ্ছাচার দৃষ্টান্তে তাহার,
কালগ্রাসে পশে অত্যাচারে ;
এই হেতু লয় কর্ত্তা দেবদেব হর।
মহাদেব ভিখারী ভাঙড়।
হেন সংস্কার
ত্রিসংসারে আর না রাখিব,
নিষ্ঠাচারে মানব স্থাপিব ভবে।
মৃত্যুহেতু ভয়,
তাই জীব সংসারে না রয় ;
মৃত্যুভয় করিব খণ্ডন।
স্বেচ্ছাচার করিব দমন,
পিশাচ না পূজা পাবে।]

* প্রয়োজন বোধে এই দৃশ্যটি বাদ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাদ দেওয়া হইলে তৃতীয় দৃশ্যের শেষে ড্রপ্ পড়িবে এবং পঞ্চম দৃশ্য হইতে দ্বিতীয় অঙ্ক হইবে, নাটকটি তিন অঙ্কের স্থলে চার অঙ্ক হইবে।

পঞ্চম দৃশ্য

(ভুবনেশ্বরীর ঠাকুর ঘর। বিধবা ভুবনেশ্বরী শিবপূজায় রত। সময় দ্বিপ্রহর)

(গান)

ভুবনেশ্বরী—[ওরে হর, বাঘাম্বর, কৃপা কর অবলায়
আকুল অকূলমাঝে, রাখ ভোলা, রাঙ্গাপায়।
না জানি এ বিসংবাদে, ফেলিবে কি পরমাদে,
প্রাণ কাঁদে—
শঙ্কর, শঙ্কটে তার, অঙ্গনা আশ্রয় চায়।]

হে শঙ্কর তোমার পূজা করি তবু—তবুও কি তোমার দয়া হয় না? আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেছো—আজ আমি রিক্ত—সহায়সম্বলহীনা বিধবা নারী। স্বামীকে হারিয়েছি, ধনদৌলত হারিয়েছি, আজ আর আমার কিছুই নেই—শুধু আছে আমার পুত্র-কন্যা। হে বীরেশ্বর, হে ত্রিশূলী তোমার বরে নরেনকে পেয়েছি, দেখো তার যেন কোন অমঙ্গল না হয়। আজ যে আর তার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। অর্দ্ধাহারে—অনাহারে শরীর তার জীর্ণ হতে জীর্ণতর হয়ে পড়ছে। আমি মা—কেমন করে তার মুখের দিকে তাকাব? কৃপা করো ভোলানাথ।

নরেন—(নেপথ্যে) হে শঙ্কর, হে মহেশ, সবারে দিয়েছো ঘর, আমারে দিয়েছো শুধু পথ—(বলিতে বলিতে নরেনের প্রবেশ) মা, মা তুমি এখানে রয়েছো আর আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ভুবনেশ্বরী—বিলে এলি। এতো বেলা পর্য্যন্ত কোথায় ছিলি বাপ্?

নরেন—আচ্ছা মা। আমি কি এখনও কচি খোকাটি আছি যে আমাকে 'বিলে' বলে ডাকো? আমি এখন নরেন—দস্তুরমত নরেনবাবু—ঠাকুর অবশ্য মাঝে মাঝে ডাকেন---লরেন বলে।

ভুবনেশ্বরী—দেখ্, তুই নরেনই হস্ আর নরেনবাবুই হস্, আমার কাছে সেই খোকা—সেই বিলে। দেখছো ছেলের কাণ্ড, কথায় কথায় আমাকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। চল্ চল্, অনেক বেলা হয়েছে, দুটি খেয়ে নিবি চল্। মুখটা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। কোথায় যে সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়াস্ জানিনা বাপু।

নরেন—এই দেখো মা, ঐ কথা বলতেই তো আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম। আমাদের সঙ্গে পড়তো সেই যে গো রামদত্ত, আজ ওদের বাড়ী নেমন্তন্ন। আমি চললুম মা। তোমরা সব খাওয়া দাওয়া করে নাও। (দ্রুত প্রস্থান)

ভুবনেশ্বরী—ওরে, আমার চোখকে কি তুই ফাঁকি দিতে পারিস্? আমি যে তোর মা—দশমাস গর্ভে ধারণ করেছি। তোর মুখ বলছে—এ সব তোর মিথ্যে কথা—তোর খাওয়া হয়নি এবং বোধহয় সারাদিন খাওয়া হবেও না। আমি কি বুঝতে পারিনি যে সামান্য খাবার থেকে ছোট ছোট ভাই বোনেদের অংশে আর তুই ভাগ বসাতে চাস্ না—ওদের তুই সবটাই ধরে দিতে চাস্। ওরে, তাই হবে—ওদের আমি সবটাই ধরে দেব --কিন্তু তোকে অনাহারে রেখে আমার মুখে কখনও অন্নজল রোচে? যাই—(প্রস্থানোদ্যত। এমন সময় একজন বৃদ্ধ লোক হাতে হুঁকো লইয়া তামাক খাইতে খাইতে

প্রবেশ। তাহার পরনে ছোট কাপড় ও বেনিয়ান। তাহার হুঁকোয় কিন্তু কল্কে নাই।)

রাজীবলোচন—বৌমা !

ভুবনেশ্বরী—আপনি কখন এলেন কাকাবাবু ? (প্রণাম)

রাজীবলোচন—আমি এইমাত্র আসছি মা। আমি বলি কি, তোমাদের অবস্থা তো এখন—বুঝতেই পারছো মা—তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর কি বোঝাবো ? তার চেয়ে আমি বলি কি, এই বাড়ীখানা আমার নামে লিখে দাও, তাহলে আমি রাজেনকে বলে মকদ্দমা তুলে নি।

ভুবনেশ্বরী—দেখি নরেন আসুক, সে কি বলে—

রাজীবলোচন—আরে সে আবার বলবে কি—সেদিনের ছোঁড়া। আর তাছাড়া মকদ্দমা চালাতেও তো কম খরচটা নেই। তোমাদের তো এর মধ্যে যথেষ্ট দেনাও হয়ে গেছে। শেষে বাড়ী যখন বিক্রী করতেই হ'বে তখন অন্য মহাজনের কাছে বিক্রী না করে আমাকেই দিয়ে দাও—তাহলে মকদ্দমা সব মিটমাট হয়ে যাবে। তাছাড়া মনে কর, আমি তো তোমাদের পর নই—সাক্ষাৎ জ্ঞাতি। তোমার দাদাশ্বশুর হ'ল গিয়ে আমার খুড়তুতো খুড়ো। তবেই বোঝো।

ভুবনেশ্বরী—দেখুন, নরেন বড় হয়েছে, যা করবার ঐ করবে।

রাজীবলোচন—আরে নরেন সেদিনের ছোঁড়া, ও এ সব জমিদারীর বোঝেই বা কি ? তাছাড়া ওকে তুমি বল্‌লেই ও রাজী হয়ে যাবে। কি বলো, তাহলে তুমি আজই ওকে বলে সব ঠিক করে ফেলো, আমিও যাই, বেলাতো বেশ হ'ল দেখি রাজেনকে

বলে তাহলে মকদ্দমা উঠিয়ে নেবার ব্যবস্থা করি। তাহলে সেই কথাই রইলো। (কথার মাঝে মাঝে তামাক খাওয়া কিন্তু কল্কে নাই সে হুঁসও নাই)

ভুবনেশ্বরী—আমায় মাপ্ করবেন কাকাবাবু, যা অন্যায় তা করতে আমি নরেনকে কিছুতেই বলতে পারবো না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানরই শিক্ষা ওকে ছোটবেলা থেকে দিয়েছি। আমার দ্বারা একাজ হবে না—আমায় আপনি ক্ষমা করুন।

রাজীবলোচন—বেশ ভালো করে বিবেচনা করে দেখো বৌমা। এ ছেলেখেলা নয়।

ভুবনেশ্বরী—না কাকাবাবু, এ কাজ আমি কিছুতেই পারবো না। বিশেষতঃ যখন জানি এ বাড়ী আমার দাদাশ্বশুর নিজের রোজগারে তৈরী করেছেন। ব্যারিষ্টার ডব্লু, সি, ব্যানার্জীও আমাদের হয়ে দাঁড়াবেন কথা দিয়েছেন।

রাজীবলোচন—কি, কি, নিজের রোজগারে তৈরী করেছেন? কত ধানে কত চাল তা আমার জানতে বাকী নেই। আমিও যাচ্ছি। আমি রাজীবলোচন দত্ত (রাগিয়া তোৎলা হইয়া) —ব-ব-বক্কেশ্বর দত্তের নাতি, আমায় অ-অ-অপমান। আ-আ-আমি দেখে নেব। (একদিক দিয়া ভুবনেশ্বরীর প্রস্থান। অন্যদিক দিয়া রাজীবলোচনের দ্রুত গমনোদ্যত। ঠিক সেই সময়ে কেবলরাম এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে পিছন ফিরিয়া প্রবেশ করিতেছিল, তাহার সহিত ধাক্কা লাগিলে রাজীবলোচনের হুঁকো পড়িয়া গেল। কেবলরাম অনেক

কষ্টে তাহার হস্তস্থিত একটি থালা যাহাতে একখানি গরদের থান ও কিছু চিনি ছিল তাহা নামাইয়া রাখিল। দুইজনেই দুইজনের দিকে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।)

রাজীবলোচন—কে, রে, তুই নচ্ছার বদমাইস্—হুট্ করে অন্দরমহলে চলে আসিস্? আমার হুঁকো কল্কে একেবারে ভেঙ্গে দিলে?

কেবলরাম—আপনি কেমনধারা মানুষ গো, এহন থালাডা একদম্ ফেইলা দিতেন আর একটু হ'লে। আরে ঘটির স্থাসের লোকগুলান্ কল্কে ছারাই তামুক খায়!

রাজীবলোচন—(হুঁকাটি কুড়াইতে কুড়াইতে) কল্কে ছাড়া? হুঁম, (স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া) বড় জ্যাঠা তো! (প্রস্থান)

কেবলরাম—(চিৎকার করিয়া) ওরে দরোয়ান সিং, থাপ্পর সিং, ভজা, জগা—মেধো—আরে কেউ রাও কাড়ে না। সব গেল কুনে? ক্ষেন্তি—বুঁচি—নাঃ ঝিয়েরাও নেই না কি? বলি ও গিধ্বড় সিং। ছপ্পড়সিং—(বেগে ক্ষান্তমণির প্রবেশ, তাহার হস্তে একখানা বঁটি, সে কুটনো কুটিতে কুটিতে চলিয়া আসিয়াছে)

ক্ষান্তমণি—কে রে সকালবেলা চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করছে? একটু কুটনো কুটতে বসেছি আর এর মধ্যে বাড়ীতে ডাকাত পড়লো। আজ ডাকাতের কান না কেটে দিতে পারি তো আমার নাম ক্ষান্তমণি নয়। (বঁটি লইয়া কেবলরামের নিকটে বেগে আসিল)

কেবলরাম—ও গিন্নী। ও ক্ষান্তমণি, আরে এযে আমি—আমি,

ডাকাত কুনে? আমি আইসি ঠকুরের কাছ থাইক্যা। তেনার ফরমাস মতো মাঠাক্‌রুণের লাইগ্যা এই সাড়ী আনসি।

ক্ষান্ত—মাঠাকরুণের জন্যে সাড়ী এনেছো তো আমার মাথা কিনেছো। আমার যে তিনমাস হ'ল এই একখানা কাপড়ে চল্‌ছে, বলি সেদিকে কি হুঁস আছে? বউকে একখানা সাড়ীও দিতে পারবে না তো বিয়ে করেছিলে কেন? যমের অরুচি! আমি বলে তাই আজও পরের সংসারে দাসীবৃত্তি করে পড়ে আছি। (পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) ওরে আমার কি দশা হবে রে। আমার এমন স্বোয়ামী জুটেছে যে দুটো খেতে পরতে দেবারও মুরোদ নেই—একখানা কাপড়ও দিতে পারে না। কার হাতে আমার বাপ্ মা আমাকে দিয়ে গেল গো! আমার কি হবে গো!

কেবলরাম—আরে গিন্নী করস্ কি? গিন্নীমা শুনতে পাবা। ক্ষেমা দাও গিন্নী, ক্ষেমা দাও। আমি কি আর সাধ কইরা বিয়া করসি। কত্তাবাবু থাকতি আমাগো বিয়া দিয়া গেলেন। আমার তো কোন আশ্রয়ই ছিল না। দ্যাশে থাকতি নাগমশাই কইলেন বগবান আসে কলকাতায়, তাই তো চইলা এলাম। এহানে ঠ্যাবতার সাথে দেহা। তেনাই তো আমারে আশ্রয় দিলেন—

ক্ষান্ত—আর গরীবের মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না দেখে কত্তাবাবু একটা মড়াখেকো বাঙ্গালের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে নিজের কছে রাখলেন।

কেবলরাম—দেহো গিন্নী মড়াখেকো বাঙ্গাল কইবা না। তোমাগো

ঘটির মুরোদ দেখসি। অহনি দেখলাম এ্যাড্ডা বুড়া কঙ্কে ছাড়াই হুক্কা কইরা তামাক খাইসে। তোমাগো দ্যাশে সবই অয়।

ক্ষান্ত—দেখো তোমাকে বারবার বলেছি ঘটিবাটি বলবে না। কথার ছিরি দেখো না। ফের যদি ও রকম বলবে তো তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। যেদিকে দুচোখ যাবে সেদিকে চলে যাব, মরণ আর কি!

কেবলরাম—আরে কও কি গিন্নী, তুমি চইলা গেলে আমার কি থাকবো—আমি যে বিধবা হমু।

ক্ষান্ত—তবে সন্ধি, বলো আর কখনও ঘটি বাটি বলে গালাগাল দেবে না।

কেবলরাম—আরে তাও কি পারি? তুমি আমার একমাত্র ইস্ত্রি।

ক্ষান্ত—তা হ্যাঁগা (নিকটে আসিয়া), আমার জন্যে একখানা সাড়ী আনবে তো?

কেবলরাম—আমার কি ইচ্ছা করে না গিন্নী? আমরা যে গরীব তা তো তোমার অজানা নয়। কি করমু আমগো ভাইগ্য। নইলে তোমার লাখান এমন সুন্দর ইস্ত্রি পরের ঘরে কাম কইরা খাইতে হয়।

ক্ষান্ত—না না, আমার কোন কষ্ট নেই। তুমি তো কদিন বাড়ী আসোনি, কি করেই বা জানবে?

কেবলরাম—ইচ্ছা কইরাই অ্যাসি নাই। তবু একটা প্যাট্ তো কম খামু। আমার তো খাওয়া জুটবোই ঠাকুরের কাছে।

রাণী রাসমণির অতিথিশালায় তো খাবার অভাব হয় না। হাঁ, কি কইতাছিলা, এ কয়দিনে কি হইছে ?

ক্ষান্ত—দরোয়ান, চাকর তো আগেই সব বিদায় হয়েছে কত্তাবাবু মারা যাবার পর। আমিই তো গিন্নীমাকে বলে ঝিয়েদেরও সব ছাড়িয়ে দিলুম। এখন তো আর এদের সেদিন নেই। হাঁড়ীতে ভাত চড়বে যে কি করে তারই ব্যবস্থা নেই। আমাদের যখন এঁরা আশ্রয় দিয়েছিলেন বিপদের সময় তখন আমাদেরও তো দেখা দরকার। আমার পোড়া গতর রয়েছে কি করতে যে এদের এই ক'টা লোকের কাজকর্ম্ম করতে পারবো না। আজ দুদিন ধরে তো বড়বাবুর খাওয়া হয় নি।

কেবলরাম—কি কইলা, বড়বাবু, আমাগো হ্যাবতার খাওয়া হয় নি ? তেনাকে যে আমি এহনই বার হইতে দেখলাম।

ক্ষান্ত—হাঁ, নিমন্ত্রণ আছে বলে তিনি এখনই বের হয়ে গেলেন। তা তুমি সাড়ীর কথা কি যেন বলছিলে ?

কেবলরাম—ঠাকুর এই সাড়ী আর চিনির থালা দিয়া কইলো—দেহ ক্যাবলরাম। এডা লরেনের মাকে দিবি কিন্তু লরেন যহন ঘরে থাকবে না তহনই ঘরে যাবি। আমিও তক্কে তক্কে রইসি, যাই দেখি হ্যাবতা ঘরের বার হইছে অমনি আমিও ঢুকসি।

ক্ষান্ত—মা ঠাক্রুণের সাড়ী, দাও দাও আমায় দাও আমি মাকে দিয়ে আসি।

কেবলরাম—তাই যাও। আমি দেহি তামুক্ টামুক্ মিলে কি না।

বুড়ারে তামুক্ খাইতে দেইখা আমারও মনডা চন্‌চন্ কইরা উঠছে। (দুজনের দুদিকে প্রস্থান)

——

ষষ্ঠ দৃশ্য

(শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের ভাড়াবাড়ী। উঠানে তুলসীমঞ্চ। গান গাহিতে গাহিতে একজন সন্ন্যাসীও একটি বালিকার প্রবেশ। সময় প্রভাত।)

গান

"শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসঙ্গিনী কে তুমি ভুবন পাবনি
নিখিল মানব কেন মা তোমারে বলিছে জগত জননী।
শ্রীরামকৃষ্ণ নামে পুলকিতা
প্রভুপদে তনুমন নিবেদিতা
জীব কল্যাণে জপতপ রতা
কে তুমি চির কল্যাণি।
আদ্যাশক্তি ভুবন মঙ্গলা
স্বরূপ লুকায়ে অভিরাম লীলা
'মা' নাম শুনিলে হয় মা উথলা
তব প্রেম—সুরধুনী।
'মা' বলে ডাকিতে শিখাও আমারে
হেরিতে তোমায় সবারি মাঝারে
মিশে যাই তব স্নেহের পাথারে
গেয়ে জয় জগবন্দিনী।"

(গান শেষ হইলে সারদাদেবী সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন।

তাঁহার হস্তে একটি রেকাবীতে কিছু চাল ও তরিতরকারী। তিনি সন্ন্যাসীর ঝুলিতে তাহা ঢালিয়া দিলেন।)

মায়া—হাঁগা, তোমার মুখখানা আজ এতো শুকনো কেন গা? তোমার বুঝি অসুখ করেছে?

সন্ন্যাসী—মার আমার শরীর খারাপ।

সারদা—না বাবা, আমি ভালই আছি। কিন্তু ঠাকুরের বড় অসুখ, গলায় ঘা, কিছুই খেতে পারেন না।

মায়া—কিচ্ছু খেতে পারে না, তবে কি হবে?

সন্ন্যাসী—কি আর হবে? উনি যে পরের রোগ নিজে গ্রহণ করেছেন। জানো তো মা সমুদ্রমন্থনে যত সব ভাল ভাল জিনিস উঠেছিল তা দেবতারা সব ভাগাভাগী করে নিলেন, শেষবারে উঠলো গরল। সে গরল কে গ্রহণ করবে? অথচ তা ফেলে দিলে বিশ্বচরাচর সব ধ্বংস হয়ে যাবে। ডাক্ তখন ভোলা মহেশ্বরকে—একটা উপায় তো করতে হবে। জগৎকে রক্ষা করতে অগতির গতি দেবাদিদেব মহাদেব সেই বিষ পান করে হলেন "নীলকণ্ঠ"। বাবার আমার সেই দশা।

সারদা—কি যে করি কিছুই বুঝতে পারছি না। মহেন্দ্র ডাক্তার তো কোন আশাই দিতে পারছেন না।

মায়া—আর সে কথাটা তো বোল্‌লে না বাবা? সেই যে মহাপুরুষ পরের পাপ নিজে গ্রহণ করে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে অমর হয়ে গেলেন।

সারদা—কি জানি কি এক অজানা বিপদের সঙ্কেতে বুক আমার কেঁপে কেঁপে ওঠে।

মায়া—সে কি গো, তোমার আবার ভয় কি ? তোমার কত ছেলে-মেয়ে, দিনরাত্রী তারা কেবল 'মা' 'মা' করছে।

সারদা—সে কথা সত্যি। ওরাই তো আমার বল—ওরাইতো আমার ভরসা। নইলে এই বিপদে আমি যে কোন কূল কিনারাই দেখতে পেতুম না।

সন্ন্যাসী—কেন মা, কূলের কাণ্ডারী যে তোমার ঘরে।

গান

ভব নদীর পারে
আমি কেমন করে যাব
ওগো কাণ্ডারী,
আমার না আছে মন্ত্র, না আছে তন্ত্র
মিছেই আমি বইছি যে গো তরী
ওগো কাণ্ডারী।

(গান গাহিতে গাহিতে সন্ন্যাসী ও মায়ার প্রস্থান। সারদাদেবী নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহাদের গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।)

— —

সপ্তম দৃশ্য

(কাশীপুর উদ্যানবাটীর একটি কক্ষ। রামকৃষ্ণ শয্যায় শায়িত। চারিধারে ভক্তবৃন্দ বসিয়া আছে। সময় সন্ধ্যা।)

গিরীশ—আপনার কষ্ট হচ্ছে, বেশী কথা বলবেন না। তাছাড়া মহেন্দ্র ডাক্তার বারনও করেছে।

রামকৃষ্ণ—আরে ডাক্তার বারণ করলেই হ'ল ? আমায় বলতে দে। হাঁ কি বলছিলুম যেন।

নিরঞ্জন—দু-রকমের সাধকের কথা বলছিলেন।

রামকৃষ্ণ—দু-রকমের সাধক দেখা যায়। যেমন বাঁদরের ছানা আর বিড়ালের ছানা। বাঁদরের ছানা আগে তার মাকে ধরে, পরে তার মা তাকে সঙ্গে করে যেখানে সেখানে নিয়ে বেড়ায়। বিড়ালের ছানা কেবল এক জায়গায় বসে মিউ মিউ করতে থাকে, তার মা যখন যেখানে ইচ্ছে হয় ঘাড়ে ধরে নিয়ে যায়। তেমনি জ্ঞানী বা কর্ম্মীসাধক বাঁদরের ছানার ন্যায় পুরুষাকারদ্বারা ঈশ্বরলাভ করতে চেষ্টা করে থাকে। আর ভক্ত সাধকেরা ঈশ্বরকে সকলের কর্ত্তা জ্ঞান করে তাঁর চরণে বিড়ালছানার ন্যায় নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে।

রাখাল—এ কথা আমাদের বলার মানে?

রামকৃষ্ণ—মানে বুঝতে পারলি না? তোদের মধ্যেও বাঁদরছানা ও বিড়ালছানা দু-রকমই আছে। কেউ বসে বসে তপস্যাকরে ঈশ্বরলাভ করবার চেষ্টা করবে আর কেউ কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরের নিকটে পৌঁছবে। মা-মাগো—

শরৎ—এই দু-রকমভাবে তাহলে ঈশ্বরের দর্শনলাভ হ'তে পারে?

রামকৃষ্ণ—ঋষিকৃষ্ণের নাম শুনেছিস্?

গিরীশ—ঋষিকৃষ্ণ আবার কে?

রামকৃষ্ণ—যাকে তোরা যীশুখ্রীষ্ট বলিস্। তিনি একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিলেন। একটি ভক্ত এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল—প্রভু, কি কল্লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে সমুদ্রের জলের ভেতর নিয়ে ডুবিয়ে রাখলেন। খানিকক্ষণ পরে হাত ধরে তুলে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কিরূপ অবস্থা

হচ্ছিল? ভক্তটি উত্তরে বল্লে—প্রাণ যায় যায়, আটুপাটু কচ্ছিল। প্রভু যীশু তখন তাকে বল্‌লেন—যখন তোমার, ভগবানের জন্যে প্রাণ এমনি আটুপাটু করবে, তখনি তাঁর দর্শনলাভ করবে।

[বাবুরাম—সত্ত্ব রজঃ আর তমঃ এই তিনগুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

রামকৃষ্ণ—সত্ত্ব, রজঃ আর তমঃ এই তিনগুণের কেউই তাঁর কাছে পৌঁছতে পারে না। যেমন, একজন লোক বনের পথে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় তিনজন ডাকাত এসে তাকে ধরলে ও তার যা কিছু ছিল সর্ব্বস্ব কেড়ে কুড়ে নিলে। তার ভেতর একজন ডাকাত বল্‌লে—এ বেটাকে রেখে আর কি হবে? এই কথা বলেই খাঁড়া উঁচিয়ে তাকে কাটতে এল। আর একজন ডাকাত এসে বল্‌লে—না হে, একে কেটো না, কেটে কি হবে? এর হাত পা বেঁধে এখানেই ফেলে রেখে যাও। পরে সকলে মিলে তার হাত পা বেঁধে সেখানে রেখে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে তৃতীয় ডাকাত ফিরে এসে বল্‌লে—আহা, তোমার কত লেগেছে, এসো আমি এখন তোমার বাঁধন খুলে দি। ডাকাতটি তখন তার বাঁধন খুলে দিয়ে বল্‌লে—আমার সঙ্গে এসো, তোমায় রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি। পরে রাস্তার নিকটবর্ত্তী হয়ে বল্‌লে—ঐ রাস্তা ধরে চলে গেলে তুমি বাড়ী পৌঁছবে। লোকটি তখন তাকে বল্‌লে—আপনি আমার প্রাণ দান করলেন, আপনি আমার বাড়ী পর্য্যন্ত আসুন। ডাকাত তখন বল্‌লে—আমি সেখানে যেতে পারবো না, লোকে টের পাবে, আমি কেবল তোমাকে রাস্তা দেখিয়ে চল্‌লুম।]

গিরীশ—তাহলে আপনি বলতে চান সত্ত্বভাব হলেও চলবে না তার চেয়েও বেশী চাই।

রামকৃষ্ণ—হাঁরে তাই। সত্ত্বভাব হ'ল সাদা রং আর রজঃ হ'ল লাল রং।

হাজরা—তোমার মধ্যে এখনও লাল রং উঁকি মারে। আমার ষোল আনা সাদা, তোমার বার আনা আর নরেনের পাঁচ-সিকে।

শরৎ—তোমার পাটোয়ারী বুদ্ধি তাই ঠাকুরকে চিনতে পারলে না।

রামকৃষ্ণ—নরেনের সম্বন্ধে তুই ঠিক কথাই বলেছিস্, আর আমাকে চিনতে পারা? কেই বা পারলো? নরেনের মনে এখনও দ্বিধা আছে। (নরেনের প্রবেশ) নরেন, এসেছিস্, বোস্ বোস্। কি ভাবছিস্? ভাবছিস্—আমি কে? ওরে যে রাম, সেই কৃষ্ণ, ইদানিং রামকৃষ্ণ।

নরেন—(রামকৃষ্ণের পা জড়াইয়া) ঠাকুর, ঠাকুর, তুমি আমায় ক্ষমা করো। এমনি করেই তুমি বার বার আমার সংশয় দূর করে দাও।

রামকৃষ্ণ—দেখ্ নরেন, তোকে অনেক কাজ করতে হ'বে, অনেক দেশে যেতে হ'বে। আমার কাছে অষ্ট সিদ্ধাই আছে—তোকে দিয়ে যেতে চাই—নিবি?

নরেন—এ পেলে কি ভগবানকে পেতে আমার সুবিধা হবে?

রামকৃষ্ণ—না।

নরেন—তবে আপনার সিদ্ধাই আপনার থাক্—আমার ওতে কোন কাজ নেই।

রামকৃষ্ণ—ঠিক বলেছিস্। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, হে অর্জ্জুন, অষ্ট-সিদ্ধির মধ্যে একটি সিদ্ধিও থাকলে পরে, আমার যে সেই পরমভাব, তা তুমি লাভ করতে পারবে না। আমি আশীর্ব্বাদ করছি, নাই বা থাকলো তোর সিদ্ধাই, তোর জয় হবে চিরকাল। ভারতের শাশ্বতবাণী বহন করে তুই নিয়ে যাবি দিক হতে দিগন্তে।

[(সারদাদেবীর প্রবেশ, হাতে একটি বাটি, চামচ ও এক গ্লাস জল)

সারদা—তুমি আবার এত কথা বলছো ? কথা বলতে কি তোমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না ?

রামকৃষ্ণ—কষ্ট খুবই হচ্ছে। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে যে আনন্দ পাচ্ছি তার তুলনায় এই কষ্ট কিছুই নয়।

সারদা—বেশ, এই সুজির পায়েসটা একটু খেয়ে নাও দেখি। (পায়েস খাওয়াইতে লাগিলেন)

গিরীশ—একি ঠাকুর তো কিছুই খেতে পারছেন না।

নরেন—সব পায়েস এমন কি জল পর্য্যন্ত গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে। তাহলে কি হবে ভাই জি-সি ?

রামকৃষ্ণ—কি আর হবে ? যা হবার তা হবেই। (সারদাকে) দেখো তোমায় যে কখানা গেরুয়া কাপড় ঠিক করে রাখতে বলেছিলু সেগুণো নিয়ে এসো তো। (সারদা ভিতর হইতে কয়েকখানি গেরুয়া কাপড় আনিয়া দিলেন।)

সারদা—এই নাও কাপড়। (রামকৃষ্ণ একেকজনকে ডাকিলে তাহারা একেকখানি কাপড় লইয়া দুইজনকে প্রণাম করিতে লাগিল।)

রামকৃষ্ণ—রাখাল, এই নাও। এই গেরুয়ার মর্য্যাদা রেখো। আজ থেকে তোমার নাম ব্রহ্মানন্দ। কালী তুমি অভেদানন্দ। নিরঞ্জন, তোমার নাম হ'ল নিরঞ্জনানন্দ। লাটুর নাম কি দেওয়া যায় ?

গিরীশ—ওরই তো সবচেয়ে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়েছে। ছোট ছেলে এসেছিল পশ্চিম থেকে চাকরের কাজ করতে।

রামকৃষ্ণ—ঠিক বলেছিস্ গিরীশ। লাটুর নাম আজ থেকে হবে অদ্ভুতানন্দ। বাবুরাম, তুমি হলে প্রেমানন্দ। কিন্তু গিরীশ, তোকে তো আর আমি এই সন্ন্যাসের বেশ দিতে পারি না। তুই কেবল লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করবি—নাটক লিখবি। শরৎ, তুমি হবে সারদানন্দ। শশী, তুই তো আমাবই কিছুই জানিস্ না, তোর নাম হ'ল রামকৃষ্ণানন্দ। আর] নরেন, তোর মনে আছে, একদিন তুই মার কাছে কি চেয়েছিলি ?

নরেন—মনে আছে। চেয়েছিলুন—ভক্তি দাও, বিবেক দাও—

রামকৃষ্ণ—ঠিক, তোর শুধু নিজের বিবেক হবে না, সকলকে বিবেক দিবি—। মার আশীর্ব্বাদে তুই হবি সর্ব্বজয়ী, জগতের মাঝে তুই আনবি এক বিপ্লবের সাড়া। তোর নাম হবে—বিবেকানন্দ। (নরেনের প্রণাম)

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

প্রথম দৃশ্য

(অরণ্যপথ। বনের মাঝে দুজন ডাকাতের সহিত সর্দ্দার রঘুডাকাত ও রাজীবলোচন সময় দ্বিপ্রহর)

রাজীবলোচন—দেখো ডাকাতবাবা, আমি বুড়ো মানুষ ; খুঁজে খুঁজে এই বনের মধ্যে এসেছি তোমার সন্ধানে। আমার যদি একটা উপকার করতে পারো তো তোমায় হাজার টাকা বখসিস্ দোব।

রঘু—বোল তো শুনি কাজটা কি ?

১নং—সর্দ্দার, এ ব্যাটা গোয়েন্দা টোয়েন্দা নয় তো ?

রাজীব—না বাবা, আমি গোয়েন্দা টোয়েন্দা নই। আমি খবর পেয়েছি এক ব্যাটা সন্ন্যাসীর ভেক্ নিয়েই এই দিকেই আসবে। তাকে যদি শেষ করে দিতে পারো তো এই টাকাটা তোমার।

রঘু—লোকটার দোষ কি ?

রাজীব—(স্বগতঃ) আসল কথা তো এদের বলা যায় না, ব্যাটা উমেশ ব্যাঁড়ুজ্যেকে দিয়ে আমার সাহেব ব্যারিষ্টারকে একেবারে ঘোল খাইয়ে দিলে—

২নং—কি রে, মুখে রা কাটছিস্ না কেনে ?

রঘু—দেখ্, ঠিক ঠিক যদি না বলিস্ তো এই লাঠি দিয়ে তোর মাথাটা একদম্ ফাটিয়ে দোব।

রাজীব—ব্যাটা ছেলে ধরে, মেয়ে ধরে, ব্যাটা দেশটাকে একেবারে উচ্ছন্নে দিলে।

রঘু—কেনে, উকি দল করেছে না কি ?

রাজীব—হাঁ ডাকাতবাবা।

রঘু—উয়ার দলে খেলোয়াড় কতজন ?

রাজীব—খেলোয়াড় কি, সে যে ধর্ম্মলোপ করবার দল করেছে, খেলোয়াড় টেলোয়াড় নেই।

রঘু—আরে তুই কি পাগলা হয়েছিস্? খেলোয়াড় ছাড়া কি দল হয়? সে নিজেও বড় খেলোয়াড় হ'বে নিশ্চয়ই। আরে খেলোয়াড় না হলে তুমার দলবল নিষে উটাকে সাবাড় করতে পার না? মরতে আমার কাছে তবে এসেছিস্ কেনে? খোঁজ করে দেখ্, দলে খেলোয়াড় আছে বই কি, আরে তা নাহলে কি দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে পারে? আমিও খোঁজ নিচ্ছি, কি নাম বল্‌লি, বিবেক না কি নাম?

রাজীব—সে নামেরও কি ঘটা—বিবেকানন্দ। ও খেলোয়াড় নয়, কি মন্ত্র জানে এই কমাসের মধ্যে দেশটাকে একেবারে নাস্তিক করে ফেল্‌লে।

রঘু—আচ্ছা, ছেলেগুলোকে ভুলিয়ে নিয়ে কি করে? সিদ্ধাই হ'বে, মা কালীর কাছে বলি দেয় না কি?

রাজীব—ওর আবার সিদ্ধাই? ব্যাটা ধর্ম্মলোপ করবার ফিকিরে আছে।

রঘু—তবে কি টাকা ভুগিয়ে নেয়?

রাজীব—তা নেয়, ব্যাটা নাস্তিক ধর্ম্ম প্রচার করছে।

রঘু—আর তুই বল্‌লি না যে মেয়ে বার করে?

রাজীব—হাজার হাজার মেয়ে ওর নাম শুনেই ছুটে গিয়ে ওর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে। এরপর কেউ পূজো আচ্ছা করবে না, বার ব্রত সব উঠে যাবে।

রঘু—বলি কারুর ধর্ম্ম নষ্ট করেছে?

রাজীব—আরে তা কেন, বুঝতে পারছো না—ছেলেমেয়ে সবাইকে ভুলিয়ে নিয়ে দল বাড়ায়।

রঘু—টাকাও নেয় না, ধৰ্ম্ম নষ্ট করে না, ব্যাটা, আমার কাছে মাম্‌দোবাজী করতে এসেছো ?

১নং—সৰ্দ্দার, এ ব্যাটা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা।

রঘু—বাঁধ ব্যাটাকে, ওকে ছাড়া হবে না। পরে বুড়োব্যাটাকে মার কাছে বলি দিলেই হবে।

রাজীব—দোহাই বাবা। তু-তু-তুমি আমার ধৰ্ম্মবাবা, আমি গোয়েন্দা নই, আমি মিথ্যে কথা বলিনি। (নেপথ্যে গান শোনা গেল) ঐ ও ব্যাটা আসছে।

রঘু—কার যেন গলা পাচ্ছি, এটাকে ধরে নিয়ে আড্ডায় যা। আমি ঐ দিক পানে লুকিয়ে দেখি। (রাজীবলোচনকে ধরিয়া ডাকাতরা চলিয়া গেলে রঘুর প্রস্থান। গান গাহিতে গাহিতে বিবেকানন্দের প্রবেশ)

(গান)

বিবেকানন্দ—

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই ?
কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে যাই !
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই।
[কে খেলায় ? আমি খেলি বা কেন ?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন,

এ কেমন ঘোর, হবে না কি ভোর ?
অধীর—অধীর যেমতি সমীর
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই।] (রঘুর প্রবেশ)

রঘু—বাঃ, কি সুন্দর গান, দেখো ঠাকুর, আমি ডাকাত, ডাকাতি করাই আমার পেশা। আমি তোমাকে মারবো বলে আসছিলুম, কিন্তু তোমাকে দেখে আর তোমার গান শুনে আমি—আমি কি করবো বুঝতে পারছি না।

বিবেকানন্দ—সে কি ভাই, কেন শুধু শুধু ডাকাতি করবে ? সৎ-পথে চলে দেশের সেবা করো—দশের সেবা করো।

রঘু—তা ঠাকুর, তোমার মুখটা অত শুকনো কেনে ?

বিবেকানন্দ—শুকনো ! আজ দুদিন কিছু আহার হয় নি। বড় জল তেষ্টা পেয়েছে।

রঘু—ক্ষিধে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে—তাইতো কি মুস্কিলে পড়লুম। দাঁড়া, দাঁড়া, কি করতে পারি দেখি। এতোকাল ডাকাতি করে এসেছি, কিন্তু তোকে দেখে এ আমার কি অবস্থা হ'ল ? কিন্তু আমাদের ঘর যে অনেক দূর। কোথা থেকে খাবার পাই ? কাছে পিঠেতো পুকুরও নেই। জল কোথা পাই ? (ছুটিয়া বাহির হইতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল) হয়েছে—হয়েছে, মনে পড়েছে, এই আমার কোঁচড়ে শশা আছে। এইটা তুই ততক্ষণ খা, আমি দেখি ঠাকুরের জন্যে কিছু জোগাড় করতে পারি কি না। (শশা দিয়া দ্রুত প্রস্থান)

বিবেকানন্দ—(শশা খাইতে খাইতে) ঠাকুর তোমার কি অপার করুণা। এমন একটা জিনিস আমাকে দিলে যে ক্ষুধা তৃষ্ণা

তুইই দূর হ'ল। (বসিয়া শশা খাইতে লাগিলেন। খাওয়া শেষ হইলে) আঃ এই সময় এক ছিলিম তামাক হ'লে বেশ হতো। (এই সময় কিষেণলাল মেথর গাঁজার কল্কে টানিতে টানিতে প্রবেশ করিল) হাঁ ভাই তোমার কল্কেটা একটু দেবে, আমিও একটু সুখ করে নি।

কিষেণলাল—নেহি মহারাজ, ইয়ে নেহি সেক্‌তা। মাঁয় ভাঙ্গি হুঁ, মাঁয় অছ্যুৎ হুঁ।

বিবেকানন্দ—তুমি ভাঙ্গি—অর্থাৎ মেথর! তবে থাক্ থাক্। আমার আর তামাক খেয়ে দরকার নেই। তুমি মেথর! (ঘৃণাভরে প্রস্থান করিতে উদ্যত এমন সময়ে সন্ন্যাসী ও মহামায়ার প্রবেশ। কিষেণলাল এককোণে বসিয়া গাঁজা খাইতে লাগিল।)

সন্ন্যাসী—সে কি বাবা, মেথরকে তুমি ঘৃণা কর? তুমি না সন্ন্যাস গ্রহণ করেছো?

মায়া—সে কি, তুমি বুঝি কিচ্ছু জানো না? সকলের মাঝে যে নারায়ণ আছেন তাও বুঝি জান না?

বিবেকানন্দ—ঠিক বলেছো ছোট্ট মা আমার। এ আমি কি করছিলুম? গুরুর উপদেশ ভুলে মেথরকে ঘৃণা করে চলে যাচ্ছিলুম। (কিষেণলালের দিকে ফিরিয়া, সন্ন্যাসী ও মায়ার প্রস্থান) বন্ধু, আমি ফিরে এসেছি। কল্কেটা একবার দাও। আমি একটু ওর স্বাদ গ্রহণ করি।

কিষেণলাল—নেহি মহারাজ, ম্যাঁয় ভাঙ্গি হুঁ।

বিবেকানন্দ—না না, আর আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না।

তুমি ভাঙ্গি নও—অছ্যুৎ নও—তুমি মানুষ। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। তুমি নরদেহে স্বয়ং নারায়ণ। (তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার নিকট হইতে কল্কে লইয়া পরম তৃপ্তির সহিত খাইতে লাগিলেন।)

(দ্বিতীয় দৃশ্য)

[(গাজীপুরে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা এক নির্জ্জন গুহার মধ্যে পওহারীবাবার আশ্রম। গুহায় আলো আঁধারের সমাবেশ। তাহারই এককোণে পওহারীবাবা গভীর ধ্যানমগ্ন। বাহিরে ঝড়বৃষ্টি হইতেছে ও ঝিঁঝি প্রভৃতি নানারকম পোকার ডাক শোনা যাইতেছে। ধীরে ধীরে এক কুৎসিৎ দর্শন চোর পাঁচিল টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। সময় গভীর রাত্রি।)

চোর—আজ তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি। আর কদিন এমনি করে পারা যায়? তাই আজ এসেছি এই আশ্রমে। যা কিছু আছে হাতিয়ে নিতে হবে। সাধুব্যাটাতো শুনেছি মৌণী। তার ওপর আজ যা ঝড়জল হচ্ছে—আশ্রমে আর কেউ নিশ্চয়ই জেগে নেই। সকালে উঠে ব্যাটারা দেখবে সব চিচিংফাঁক্। অনেক বড় বড় লোক তো আশ্রমে ভেট্ নিয়ে আসে। কাজেই সোনাদানারও অভাব হ'বে বলে মনে হয় না। দেখা যাক্, ভাগ্যে কি আছে। এই যে একটা কমগুলু দেখছি। বাঃ, জিনিসটা তো বেশ। এই চাদরটাতে সব বাঁধি। ওটা কি? ঘড়া—এটা তো নিতেই হবে। এটা বেচে দু পয়সা হবে। এ কাপড়গুলোই কি এখানে পড়ে থাকবে না কি? কিন্তু গেরুয়া। গেরুয়া কাপড় বেচতে

গেলে যদি ধরা পড়ি ? না না বেশ করে গরমজলে কেচে নিলেই নিশ্চয়ই রং উঠে যাবে। কাজেই এগুণোও থাক। পূজোর থালাটাই বা বাদ যায় কেন ? হাঁ, কোশাকুশিতো নিতেই হবে। বাসন-কোসন, কাপড়চোপড় তো সব বাঁধা হলো কিন্তু টাকা পয়সা কৈ ? ঠাকুরের গয়নাগাঁটিই বা কোথায় ? দেখি ওদিকটায়। এই তো সাধুব্যাটা বোমমেরে বসে আছে। এর আসনের নীচে নেই তো ? (আসনের নীচে দেখিতে গেলে সাধু চক্ষু খুলিবেন)

পওহারীবাবা—কোন্ রে বেটা ? (চোর পুঁটলি ঘাড়ে করিয়া পলাইতে উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু সাধুর গলার আওয়াজ পাইয়া পুঁটলি ফেলিয়া পলাইলে সাধু তাহার পিছনে পুঁটলি লইয়া দৌড়াইলেন। পরে তাহাকে ধরিয়া পুনঃপ্রবেশ। পুঁটলি দেখাইয়া) এঠো লে যাও বেটা (চোর ভয়ে নীরব) ইয়েসব চিজ্ আপকো জরুরৎ হ্যায়, আপ্ কৃপা করকে মেহেরবাণী করকে লে যাইয়ে (চোর নীরব) আপ্ মেরা অতিথি—মেহেরবাণী করকে ডেরামে আয়া—এ সমুচা লিজিয়ে। (চোর তথাপি নীরব) হাম্ মৌণী থা, আজ আপ কেঁউ মৌণী হো গিয়া ? দয়া করিয়ে—কৃপা করিয়ে (চোরের পদধারণ) আপ্ নারায়ণ—আপ্ হামরা নারায়ণ—প্রভু কৃপা করিয়ে।
(বিবেকানন্দের প্রবেশ)

বিবেকানন্দ—নমো নারায়ণায়।

পওহারীবাবা—নমো নারায়ণায়।

বিবেকানন্দ—ঠিক বলেছেন—সকলের মধ্যেই নারায়ণ আছেন।

আপনি অতি উচ্চমার্গে উঠেছেন সাধুবাবা। ওহে তুমি (চোরকে) এ সব নিয়ে চলে যাও। সাধুবাবা যখন নিজে হাতে তোমাকে সব দিচ্ছেন তখন তোমার ভয় কি? কিন্তু জীবনে আর কখনও চুরি কোর না, সৎপথে থেকো, বাবার কৃপায় তোমার মঙ্গল হবে। (চোর কিছুক্ষণ দুজনের দিকে তাকাইয়া দুজনকে প্রণাম করিয়া পুঁটলি লইয়া প্রস্থান করিল)

বিবেকানন্দ—আচ্ছা সাধুজী, তিতিক্ষা ক্যায়সে বনে মহারাজ?

পওহারীবাবা—যন্ সাধন্ তন্ সিদ্ধি। আউর গুরুকো ঘরমে নাওকো মাফিক্ পড়া রহো।

বিবেকানন্দ—মহারাজ, আপনার কাছে যোগশিক্ষার জন্যে দীক্ষা নেবার ইচ্ছা হয়েছিল। আপনিও কাল রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু কাল রাত্রে এক অদ্ভুৎ স্বপ্ন দেখি। আজ সারাদিন যতবার আপনার আশ্রমে আসবার চেষ্টা করেছি কে যেন আমার পা টেনে ধরেছে—কিছুতেই আমি আসতে পারি নি। আপনার কাছে সত্যেবদ্ধ। তাই এই গভীর রাত্রে, দারুণ দুর্য্যোগেও আমাকে আসতে হয়েছে।

পওহারীবাবা—কেয়া, গোড় পাকাড়কে রাখা? কেয়া তাজ্জবকি বাৎ?

বিবেকানন্দ—আজ্ঞে হাঁ। যতবার আমি গুহাভিমুখে পা বাড়িয়েছি অমনি কে যেন আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরেছে। পা যেন আর নড়ে না—সর্ব্বশরীর অবশ—নিজের দেহটাকে যেন নিজে বইতে পারছি না। অন্তর থেকেও কে যেন বলে উঠ্‌লো—কোথা যাও?

পওহারীবাবা—(হাসিতে হাসিতে) গুরুকা কৃপা। আউর স্বপনমে কেয়া দেখা ?

বিবেকানন্দ—যখন আমি গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন—সহসা দেখলুম, ঠাকুর এসে দাঁড়িয়েছেন আমার সম্মুখে। কি পবিত্র, সৌম্য, নির্ম্মল-মূর্ত্তি—প্রশান্ত নেত্রে কি গভীর স্নেহ—কতই না করুণা, ললাটের দিব্য জ্যোতিতে যেন সারা কক্ষ আলোকিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আনন্দঘন মূর্ত্তির মাঝে কি এক নিবিড় বিষাদের ছায়া তাঁর মুখমণ্ডলে। কি গভীর বেদনায় ছল্‌ছল্‌ করছে দুটি পদ্মপলাশলোচন। অভিমানভরা বেদনাভরা কণ্ঠে যেন বলছেন—ওরে আমাকে ঠেলবি কোথায় ? আমি তোর ধর্ম্মে—আমি যে তোর মর্ম্মে—আমি যে তোর প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। আচম্বিতে আমি বলে উঠ্‌লুম—না না, এ হতে পারে না—না না না তোমার চরণ ছাড়া এ দাস কোথাও যাবে না—যেতে পারে না। আমায় ক্ষমা কর। আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর—আমি যে ঘোর অবিশ্বাসী—আমি যে মহাপাতক।

পওহারীবাবা—(হাসিতে হাসিতে) আও বেটা, ইধার আও। দেখো তোম্‌হারা সাম্‌নেমে। (বিবেকানন্দ দেখিলেন একখানি শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি)

বিবেকানন্দ—একি, একি, এ কার ছবি ?

পওহারীবাবা—ইয়ে সাক্ষাৎ ভগবানকা অবতার। (বিবেকানন্দ স্থির দৃষ্টিতে সেই ছবির দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার দুইচক্ষে ধারা বহিতে লাগিল)

বিবেকানন্দ—আমার যে সন্দেহ কিছুতেই মিটতে চাইছিলো না ঠাকুর! তাইতো তুমি এই মহাজ্ঞানী সন্ন্যাসীর মুখে আমাকে শুনিয়ে দিলে—তুমিই সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার। ঠাকুর, ঠাকুর, আমায় ক্ষমা কর ঠাকুর। আমার প্রণাম গ্রহণ কর প্রভু।]

তৃতীয় দৃশ্য

(আলোয়ারের দেওয়ান রাজচন্দ্রজীর কক্ষ। সাহেবীবেশে মহারাজ মঙ্গলসিং, দেওয়ান রাজচন্দ্রজী ও কয়েকজন পার্ষদ। দেওয়ালে কয়েকটি ফটো, তাহার মধ্যে একখানি মহারাজের। বিবেকানন্দ ও নুরমহম্মদের প্রবেশ। সময় প্রভাত।)

রামচন্দ্রজী—আসুন স্বামীজি, আজ আপনি আমার অতিথি। আপনি আসন গ্রহণ করুণ। আপনাকে দেখবার জন্য এ রাজ্যের মহারাজা আজ আমার কুটিরে স্বয়ং উপস্থিত হয়েছেন। কি আহার গ্রহণে ইচ্ছে করেন?

বিবেকানন্দ—দেখুন, আমি পরিব্রাজক। সারা ভারতবর্ষকে দেখবো—চিনবো বলেই দেশ হ'তে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমাকে যদি আশ্রয় দিতে চান তো আমার সঙ্গী এই ভদ্রলোকটিকেও অতিথিরূপে স্বীকার করতে হবে।

রামচন্দ্রজী—সে কি কথা স্বামীজি? ওযে পিয়োন—ও যে মুসলমান্!

বিবেকানন্দ—মুসলমান্! মুসলমান কি মানুষ নয়? যে ভগবান আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি ওকে সৃষ্টি

করেন নি? ইনি আমাকে বহুদূর হ'তে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন। দয়া করে মুসলমান্ বলে যেন একে হোটেল দেখিয়ে দেবেন না। আর যদি নিতান্তই আমার এই বন্ধুটিকে আশ্রয় দিতে না চান্ তাহলে বলুন, আমি অন্যত্র যাই। পথের ধারে থাকবো তবু আমার সাথীকে পরিত্যাগ করতে পারবো না। আমার গেরুয়ার অপমান করতে পারবো না।

রামচন্দ্রজী—দয়া করে আপনারা দুজনেই আসন গ্রহণ করুন।

মঙ্গলসিং—আচ্ছা স্বামীজি, আপনি গেরুয়া পরেন কেন?

বিবেকানন্দ—গেরুয়া দরিদ্রের ভূষণ। আমি যদি সাধারণ কাপড় পরতাম, ভিক্ষুক এসে আমার কাছে ভিক্ষে চাইতো। বুঝতো না যে আমিও একজন ভিক্ষুক। নিজের কাছে কতো সময় একটা পয়সাও থাকে না, কি করে মেটাতাম্ তাদের প্রার্থনা? একজন চাইবে অথচ আমি দিতে পারবো না এ ভাবতেও পারা যায় না। তার চেয়ে এই গেরুয়াই ভাল, গেরুয়াই স্পষ্ট। কেউ আর চাইবে না কাছে এসে। ভাববে এতো আমাদেরই মত একজন, আমাদেরই মত দীনহীন। ভিখারী কি ভিখারীর কাছে ভিক্ষে চায়?

মঙ্গলসিং—শুনতে পাই আপনি একজন প্রকাণ্ড পণ্ডিত। ইচ্ছে করলেই তো অনায়াসে রোজগার করতে পারেন, তবে এমন ছন্নছাড়ার মত ভিক্ষে করে বেড়ান কেন?

বিবেকানন্দ—(হাসিয়া) শুনতে পাই আপনি একটা রাজ্যের শাসনকর্ত্তা। ইচ্ছে করলেই তো অনায়াসে প্রজার হিতসাধন

করতে পারেন, তবে এমন উন্মাদের মত সাহেবিয়ানা করে বেড়ান কেন?

রামচন্দ্রজী—মহারাজ—

মঙ্গলসিং—(হাত তুলিয়া তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিয়া) কেন বেড়াই? আমার খুসি।

বিবেকানন্দ—আমারও সেই কথা। আপনার খুসি সাহেব সেজে, আমার খুসি ফকির সেজে।

মঙ্গলসিং—কিন্তু যাই বলুন, মূর্ত্তিপূজা আমি বিশ্বাস করি না। আপনি করেন?

বিবেকানন্দ—করি।

মঙ্গলসিং—কাঠ, মাটি, পিতল, পাথর এদেরকে ভগবান ভাবেন?

বিবেকানন্দ—(দৃঢ়স্বরে) ভাবি।

মঙ্গলসিং—(পরিহাস সুরে) আমি যে ভাবতে পারি না, আমার কি উপায় হবে?

বিবেকানন্দ—ভাববেন না। (দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া) ওটা কার ফটো?

রামচন্দ্রজী—আমাদের মহারাজের।

বিবেকানন্দ—ওটাকে নামিয়ে আনুন তো। (একজন ফটোটি নামাইয়া তাঁহার হস্তে দিল) দেওয়ান্, এটার ওপর থুতু ফেলুন। (সকলে হতবুদ্ধি হইয়া স্থির হইয়া রহিল) ফেলুন থুতু—মারুন লাথি। কেন সঙ্কোচ হচ্ছে? সঙ্কোচ কিসের? এতো এক টুকরো একটা কাগজ। এতে থুতু ফেলতে আপত্তি কি?

রামচন্দ্রজী—এ কি বলছেন স্বামীজি? এ যে মহারাজের প্রতিচ্ছবি।

বিবেকানন্দ—তাতে কি? এতো একখানা কালিমাখা কাগজ, এর মধ্যে মহারাজ কোথায়? এতে থুতু ছিটোলে থুতু তো কাগজেই পড়বে, মহারাজের গায়ে পড়বে না। তবু থুতু ফেলছেন না কেন? ফেলছেন না এইজন্যে যে এ মহারাজের ছায়া। একে দেখলে মহারাজকেই মনে পড়ে। একে কলঙ্কিত করলে মহারাজকেই অপমান করা হয়। তাই এ শুধু পটে আঁকা ছবি নয়—শুধু কালিমাখা কাগজ নয়, এ ছদ্মবেশী মহারাজ। (মহারাজের দিকে তাকাইয়া) এক অর্থে আপনি এতে বর্ত্তমান। আপনি নেই বলে একে ছিন্ন করা যায়, মলিন করা যায়, আবার আছেন বলে আপনার ভক্ত সেবকের দল একে শ্রদ্ধা করে, প্রণাম করে। তেমনি প্রতিমা এক অর্থে মৃত্তিকা, অন্য অর্থে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া। আমরা কি আর মাটিকে পূজা করি, মাটির মাধ্যমে পূজা করি ভগবানকে! আপনার ভক্ত সেবকেরা কি কাগজকে শ্রদ্ধা করে, কাগজের মাধ্যমে শ্রদ্ধা করে আপনাকেই।

মঙ্গলসিং—(প্রণাম করিয়া) আমায় ক্ষমা করুণ স্বমীজি। চলুন আমার প্রাসাদে।

বিবেকানন্দ—যেতে পারি এক সর্ত্তে।

মঙ্গলসিং—বলুন, কি আপনার সর্ত্ত?

বিবেকানন্দ—শুধু ধণীরা নয়, শুধু গণ্যমান্যের দল নয়, অধম অক্ষম দিনদরিদ্রেরাও যদি আসতে চায় আমার কাছে, দ্বার খোলা

রাখবেন তাদের জন্যে। নির্ব্বিবাদে আসতে দেবেন সকলকে। অশন-বসন নেই তো না থাক্, সকলের অবারিত দ্বার। বলুন রাজি ?

মঙ্গলসিং—রাজি।

বিবেকানন্দ—আপনার মঙ্গলসিং নাম সার্থক করে তুলুন আজ থেকে। আসুন মহারাজ।

নুরমহম্মদ—স্বামীজি, এতক্ষণে আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে আপনাকে দেখছিলুম এবং আপনার কথা শুনছিলুম। আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি যে হিন্দুধর্ম্ম এতো উদার। একজন অপরিচিত মুসলমান সঙ্গীকে আপনি ত্যাগ করতে পারলেন না। যে ধর্ম্ম এতো উদার, যার সাধু এতো মহান্, সে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাকে জানতেই হবে।

বিবেকানন্দ—ভুলো না বন্ধু, আমরা ভারতবাসী—হিন্দু মুসলমান একই মায়ের তুই সন্তান।

নুরমহম্মদ—ভুলবো না স্বামীজি। আজ থেকে আমি ভারতবাসী। ভারত আমার মা, হিন্দু আমার ভাই। জীবনে বহু অনাচার করেছি—বহু পাপ করেছি—মহাপাতকী আমি। যবন বলে, ঘৃণাভরে আমাকে দূরে ফেলে দেবেন না গুরুদেব। পদাশ্রয়ে একটু আশ্রয় দিন। (পদধারণ) আমাকে দীক্ষা দিন। আমি আপনার শ্রীচরণের দাস।

বিবেকানন্দ—এখন তো তা হয় না ভাই। এখন আমি পরিব্রাজক। তুমিও আমার সঙ্গে চলো। দেশে ফিরে তোমাকে দীক্ষা দেব। ওঠো পায়ের তলায় কেন? (উঠাইয়া) তোমার

স্থান তো পায়ের তলায় নয়—তোমার স্থান এই বক্ষে। (আলিঙ্গন) তুমি আমার ভাই।

চতুর্থ দৃশ্য

(দক্ষিণেশ্বরে সারদামণির কক্ষের বহির্ভাগ। ভিতরে একটা দরজা দেখা যাইতেছে। ঝাঁটা হাতে কেবলরামের প্রবেশ। সময় প্রভাত।)

কেবলরাম—নোংরা আমার সয় না বাপু। আর এ পোড়া ত্থাশের লোকগুলান্ও হইসে তেমনি নোংরা। মার ঘরের সামনে করসে যেন আস্তাকুঁড়। আজ সাফ্ করমু তবে আমার নাম ক্যাবলরাম। ত্থাবতা আমার যাবার সময় কইয়া গ্যালা—ত্থাখ্, আমার মাকে দেখিস্—মার যেন কোন কষ্ট না হয়। আরে আমি দেখবো না তো কি দেখবে এই সব আনন্দ পল্টনের দল—গেরুয়া পইরা ঘুইরা বেড়াইবা না মাকে দেখবা? হুঁ, আজ সব সাফ্ করমু। (ঝাঁট দিতে লাগিল) কে র‍্যা, এহন এহানে আসিস্ না। ইসে, বলি কথাডা কি শুনতে পারসস্ না? আরে মলো তবু এগিয়ে আসে? যা হয় কপালে, আজ তবে সব বিটলে ভক্তদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করমু। (ঝাঁটা লইয়া দ্রুত অগ্রসর হইলে ঘোমটা দিয়া ক্ষান্তমণির প্রবেশ করিয়া একেবারে তাহার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল) তবে আজ তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন। ওমা, এযে ক্ষেন্তী—ক্ষান্তমণি (হাত হইতে ঝাঁটা পড়িয়া গেল)

ক্ষান্তমণি—আ মরণ তুমি—তুমি এখানে ঝাঁট্ দিয়ে মরছো? বলি বাড়ীতেতো কুটোটি নেড়েও দেখো না। আর এখানে কি ঝাড়ুদারের চাকরী নিয়েছো?

কেবলরাম—আরে তুমি বোজঝনি গিন্নী—ইসে—

ক্ষান্ত—রাখো তোমার ইসে আর ইসে। সংসারের একটা কাজ করতে পারো না, আর যত সব মেথর, মুদ্দোফরাস্ জমাদারের কাজ করতেও লজ্জা করে না? আ মরণ!

কেবলরাম—আহা হা চটো ক্যান্, চটো ক্যান? তা গিন্নী, তুমি এখানে কি মনে কইর‍্যা? আর আইলাই বা ক্যামনে—কেডা তোমায় আনসে?

ক্ষান্ত—আমি এসেছি মা কালীর পূজো দিতে।

কেবলরাম—মা কালীর পূজা দেবা তুমি? সব্বনাশ্!

ক্ষান্ত—মা ভবতারিণীর পূজো দোব তাতে আবার সর্ব্বনাশটা কি রকম? আ মরণ!

কেবলরাম—সব্বনাশের আর বাকী রইলো কি? ওরে আমার কি হ'বে রে—আমি কোথায় যাবো রে—আমার যে সব্বনাশ হ'ল রে—

ক্ষান্ত—আ মরণ, বলি চেঁচাচ্ছো কেন? এই সকালবেলা ষাঁড়ের মতো চিৎকার করছো কেন?

কেবলরাম—আরে আমার একটামাত্র ইস্ত্রি সে যে বৈকুণ্ঠে চলে যাবে রে! আমার কি হবে রে! আমার এ সব্বনাশ হলো কেন রে? ঠ্যাবতা তুমি কোন দূরদেশে চলে গেলে—একবার দেইখ্যা যাও, তোমার ক্যাবলরামের কি হ'ল রে—

ক্ষান্ত—আ মরণ ! শুধু শুধু চেঁচাচ্ছো কেন ? বলি সকাল বেলায় কিছু চড়িয়েছো নাকি ?

কেবলরাম—কি যে কও গিন্নী ? বলি মা কালীর পূজো করলে কি আর কেউ এই আমাগো ইহ জগতে বাঁইচ্যা থাকে ? সে তো স্বর্গে যাবে গো। তার লাইগ্যা তো বৈকুণ্ঠ থেকে রথ আসবে গো।

ক্ষান্ত—আ মরণ ! এ বলে কি ? একবার পূজো করলেই অমনি বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। আরে সে ভাগ্য কি আর আমার হবে ? তাহলে আর তোমাকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরবে কে ?

কেবলরাম—আরে কও কি গিন্নী ? ঠাকুর কইছেন—একবার মার নাম করলেই ভবসিন্ধু পার হওন যায়। আর তুমি কি না সেই বেটির পূজা করবা ? দেখতাছ না কি ভয়ঙ্করী চেহারা ? গলায় মুণ্ডমালা। হাতে খড়্গ, মুখ হ'তে রক্ত ঝরে পড়ছে—কি ভীষণ। উনি যারে কৃপা করেন তাকে একেবারে স্ববংশে সারেন। আরে হুন নাই—শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যদুটো কি আরামেই না বাস করতাছিল—ঐ দুটোকে ধইর‍্যা একেবারে ক্যাচাং। আরে তুই মেয়েমানুষ। তোর এসব যুদ্ধটুদ্ধ কেন রে বাপু ? আর সুরথ রাজাটা। রাজ্য খুয়াইয়া বনে বনে ঘুইর‍্যা বেড়াইল। ও বেটির নাম মুয়ে আনিস্ না গিন্নী—এহনি মরবি। আর তা না হইলে কবে কোথায় দেখস্ স্বামীর বুকে পা দিয়া ন্যাংটা স্ত্রী নাচতাছে আনন্দে অট্টহাস্য কইরা। এ কি যে সে দেবতা। এ স্বয়ং চামুণ্ডা—রাক্ষসী মা আমার সব্বনাশী।

ক্ষান্ত—আ মরণ ! এযে মার নিন্দে করে। যে মুখে মার নিন্দে করছিস্ সে মুখ যে একেবারে খসে যাবে। যোমের অরুচি ! আ মরণ !

কেবলরাম—নিন্দা আবার কোনখানডা ! এইটাই সংস্কৃত কইর‍্যা কই তাহলেই স্তব হইয়া উঠবো। তা যাই কওনা গিন্নী। তোরে আমি ঐ চামুণ্ডা বেটির পূজা করতে কিছুতেই দিমু না। শেষে কি আমি বিধবা হমু ? আরো তেত্রিস্‌কোটি দ্যাবতা আছে যারে ইচ্ছা যায় তারে পূজা কর কিন্তু এই বেটির পূজা আমি কিছুতেই করতে দিমু না। (তাহার হাত জোর করিয়া ধরিল।)

ক্ষান্ত—আরে একি পাগল হয়ে গেল নাকি ? আমার এমন সোয়ামী শেষে কি পাগল হয়ে গেল। মা—মা

কেবলরাম—কিছুতেই আমি তোরে কালীঘরে যাইতে দিমু না। দেখি ক্যামন কইর‍্যা তুই যাস্ ? এই আমি এহানে শুয়ে পড়লাম, প্যারস্ যদি আমার বুকের উপর পা দিয়া কালী হইয়া কালীঘরে যা। (শুইয়া পড়িল)

ক্ষান্ত—ওগো আমি কোথায় যাব গো ? আমার সোয়ামী যে একেবারে পাগল হয়ে গেল গো—(বসিয়া পড়িয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ভিতরের দরজা দিয়ে সারদামণির প্রবেশ।)

সারদা—কি হয়েছে এখানে, এতো চেঁচামিচি কেন ?

কেবলরাম—(উঠিয়া) কিছু হয় নাই মা। এই আমার ইস্ত্রি এসেছে--কয় কালীর পূজা করমু। তা আমি কইছি—কালীর

পূজা কইর‍্যা কি হইবো তারচেয়ে আমার হ্যাবতা কয়—আমার জ্যান্ত দুগ্‌গা—সেই জ্যান্ত দুগ্‌গা—আমার মার পূজা কর। দেখ্‌ ক্ষেন্তি, তোর সামনে আমাগো মা—মাকে প্রণাম কর, তোর সব দুঃখু দূর হইবো। (ক্ষান্তর প্রণাম।)

সারদা—থাক্‌ মা থাক্‌, সাবিত্রীসমানা হও। তুমি বুঝি আমার রামের বৌ? তা বেশ লক্ষ্মী বৌ তো। চলো মা ভেতরে বসবে চলো। তা তোমাদের কিসের ঝগড়া হচ্ছিল মা?

ক্ষান্ত—ঐ ও বলছিল যে মাকালীর একবার পূজো করলেই নাকি বৈকুণ্ঠে চলে যায়। আরো কতসব নিন্দে করছিল।

সারদা—ওটা যে আমার পাগল ছেলে। ওর মত ভক্ত হয় না। ওর বিশ্বাস মা কালীর নাম করলেই ভবসিন্ধু পার হওয়া যায়। ও ঠাকুরের কথা পূর্ণ বিশ্বাস করে। নরেনকে বলে দেবতা। ওর মতো কি ছেলে হয়? তা এসো মা তুমি ভেতরে, আজ আর আমার মাকে না খাইয়ে ছাড়ছি না। ঠাকুরের প্রসাদ খেয়ে তবে যাবে। (হাতে একখানা চিঠি লইয়া শশির প্রবেশ।)

শশি—মা আপনার একখানি চিঠি এসেছে।

সারদা—আমার চিঠি, কে লিখেছে?

শশি—কি জানি। হাতের লেখা দেখে মনে হচ্ছে আমাদের নরেনের লেখা।

সারদা—আমার নরেন লিখেছে? দাও দাও আমায় দাও। কতদিন নরেন আমার কোলছাড়া। ও যে ঠাকুরের কাজ

করতেই এসেছে—ওকি আমার কাছে বসে থাকতে পারে, না আমিই ওকে ধরে রাখতে পারি ? (চিঠি খুলিয়া) তুমিই জোরে জোরে পড়তো শুনি কি লিখেছে। কেমন আছে—

শশি—(চিঠি পাঠ) মাতাঠাকুরাণী শ্রীচরণকমলে শতকোটি প্রণাম-পূর্ব্বক নিবেদনমিদং। ভারতের শেষপ্রান্তে অবস্থিত কন্যাকুমারিকা হইতে পত্র লিখিতেছি। কাল আমার জীবনে এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে—আশ্চর্য্য ঘটনা না বলিয়া তাহাকে আশ্চর্য্য উপলব্ধি বলিলে বোধহয় ঠিক হইবে। কন্যাকুমারির বেলাভূমিতে সূর্য্যাস্তকালে বসিয়াছিলাম। সম্মুখে অনন্ত বারিধি—পশ্চাতে বিরাট মহাদেশ। মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম—[বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী আমি, তপস্যাবলে মোক্ষলাভ করিলেই কি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা স্বার্থক হইবে ? ইহাই কি আমার জীবনের চরম কথা ? এই যে বিরাট জরাজীর্ণ দেশ,] স্বর্গাদপি গরিয়সী এই জন্মভূমির নিকট আমার কি কোন ঋণ নাই। তাহার প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই ? [না, না, স্বর্গ আমি চাহি না, নিজের মোক্ষও আমি চাহি না, দক্ষিণেশ্বরের শিক্ষা তাহা নহে। আমার মাতৃভূমির সেবায় আমি আত্মোৎস্বর্গ করিব, আমার কোটি কোটি দীনদুঃখী স্বদেশবাসীর জন্য আত্মবলি দিব। ঠাকুরের ভাবধারা জগৎময় প্রচার করিব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়ের মধ্যে এক বিপুল শক্তির চাঞ্চল্য অনুভব করি।] আমার বন্ধুরা বলিতেছে যে আমেরিকায় ধর্ম্মমহাসভায় আমার হিন্দুধর্ম্মের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত। কিন্তু কিরূপে তাহা

সম্ভব হইতে পারে? আমি এক ক্ষুদ্র ভারতবাসী। কখনও বক্তৃতা করি নাই, কিরূপে সেই বিরাট গুণিজনের সমক্ষে বক্তৃতা করিব? কে আমাকে পথ দেখাইবে—কে আমার সহায় হইবে? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। হঠাৎ দেখিলাম শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিব্য-দেহে সমুদ্রকূল হইতে বিস্তীর্ণ সলিলোপরি পদব্রজে অগ্রসর হইতেছেন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিবার জন্য হস্ত সঙ্কেতে ইঙ্গিত করিতেছেন। এইরূপে আমার সমস্ত দ্বিধা, সঙ্কোচ, সন্দেহ বিদূরিত হইল। কিন্তু মাতাঠাকুরাণীর আদেশ ও আশীর্ব্বাদ ব্যতিত সুদূর বিদেশে যাওয়া কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তাই পুত্র অনুমতি চায়—মায়ের আশীর্ব্বাদ ভিখারী। প্রণতঃ নরেন।

সারদা—নরেন আমার এ্যামেরিকা যাবে, আমার অনুমতি চেয়েছে? মায়ের প্রাণ কেমন করে বিদেশে—অতদূরে যেতে দিই? কিন্তু যেতে ওকে হবেই—ঠাকুরের কাজ। শশি, তুমি বাবা, আমার নামে নরেনকে একখানা চিঠি লিখে দাও—আমি অনুমতি দিচ্ছি—ও যেন দেশের কাজে বিদেশে ঘুরে আসে। ঠাকুর সব সময়েই ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।

কেবলরাম—কি মজা। দ্যাবতা বিলেত যাইবো। আমি এহনি যাই সবাইকে বলতে হবে—দ্যাবতা আমার বিলেত যাইবো—হাঃ হাঃ কি মজা—(বেগে প্রস্থান)

———

পঞ্চম দৃশ্য

(খেতুড়ীর মহারাজের প্রাসাদের একটি সুসজ্জিত কক্ষ। মহারাজের সহিত কয়েকজন সভাসদ বসিয়া আছেন। রাজনর্ত্তকী লছমীবাই নৃত্যের জন্য প্রস্তুত। মাঝে মাঝে ইংরেজ রেসিডেণ্ট্ টমাস্‌কে সুরা পরিবেশন করিতেছে। সময় রাত্রি।)

টমাস্—মহারাজ, টোমার বাইজী বহুত আচ্ছা আছে—বহুৎ খুপ্‌সুরৎ আছে। নাচাগানা সুরু হ'ক এবার।

মহারাজা—আপনি তো জানেন আজ কিসের এই উৎসব। আমার গুরুজী কাল রাজধানীতে এসেছেন। সেবার যখন এসেছিলেন তিনি আশীর্ব্বাদ করে গিয়েছিলেন আমার পুত্রসন্তান হবে। তাঁরই কৃপায় আজ আমি পুত্রের পিতা। তিনি শীঘ্রই আমেরিকা যাবেন। অনেক কষ্টে দেওয়ান জগমোহন তাঁকে কয়েকদিনের জন্য এখানে ধরে আনতে পেরেছেন। তিনি পাশের ঘরে বিশ্রাম করছেন। জগমোহন তাঁকে নিয়ে আসবে। তবে লছমীবাই, এবার তোমার নৃত্য সুরু করো। এমন নাচ দেখাবে যেন স্বামীজি মুগ্ধ হ'ন।

লছমী—আমার কসুর হবে না। (নৃত্য আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ নৃত্য চলিবার পর হঠাৎ বিবেকানন্দ প্রবেশ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। নৃত্য বন্ধ হইয়া গেল।)

জগমোহন—[প্রবেশ] মহারাজ, স্বামীজি বল্‌লেন—নাচ্ দেখবার তাঁর সময় হবে না।

লছমী—আমি পতিতা—পঙ্কে আমার জন্ম, তাই বুঝি স্বামীজি এসেও ঘৃণাভরে ফিরে গেলেন। আমি মহাপাতকী। কিন্তু

ঠাকুর, তুমি—তুমিও আমাকে ঘৃণা করবে? তুমিই তো বিষ দিয়েছো, কাজেই বিষ উদ্গীর্ণ করবো না তো কি করবো?

(স্থিরভাবে বসিয়া তানপুরা লইয়া টুং-টাং করিতে লাগিল)

টমাস্—বাঃ, বাইজী বাঃ, টোমার নাচ দেখিয়া হামি মুগ্ধ হইয়াছি। এই লও তোমার ইনাম। (টাকা ছুঁড়িয়া দিল)

মহারাজ—তাইতো জগমোহন, গুরুজী চলে গেলেন? তাঁরই জন্য আজকের উৎসব। তিনি না এলে যে সবই বৃথা। নাচগান যদি তাঁর ভালো না লাগে তো অন্য কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।

টমাস্—টোমরা এই স্বামীজিকে হইয়া বহুট্ বাড়াবাড়ী করিতেছো। এটো সুন্দর নাচটা টোমরা মাটি করিয়া দিলে। (বিবেকানন্দের প্রবেশ)

বিবেকানন্দ—আপনাদের নাচ মাটি হয়ে গেল বলে সত্যিই আমি দুঃখিত।

মহারাজ—আসুন, আসুন গুরুজী। আপনার জন্যই আমরা অপেক্ষা করে আছি। আসন গ্রহণ করুন স্বামীজি। (টমাস্ উঠিয়া সেক্‌হাণ্ড করিল)

টমাস্—Good evenning Swamiji. I am glad to meet you here.

বিবেকানন্দ—So I am. কাল সকালেই আমাকে বম্বে যেতে হবে।

মহারাজ—কালই?

বিবেকানন্দ—আপনি তো জানেন কদিন পরেই বম্বে থেকে আমার জাহাজ ছাড়বে।

টমাস্—হামি শুনিয়া বহুট্ সুখী হইলাম—আপনি সিকাগো যাইতেছেন ধর্ম্মমহাসভায় যোগ দিবার জন্য। হামি সদাশয় বৃটিশ্ গভর্ণমেণ্টকে বলিয়া আপনার জন্য একটা গ্রাণ্ট্ করিয়া দিব।

বিবেকানন্দ—ধন্যবাদ, আপনাকে এবং আপনার সদাশয় সরকার বাহাদুরকে। আমার তার প্রয়োজন হবে না। আপনাদেরই বাইবেল বলছে—It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich-man to enter into the kingdom of God. আমার খরচের জন্য মহিশূর, খেতুড়ী, জয়পুর, রামনাদ, আলোয়ার ও কাশ্মীরের মহারাজেরা এবং অন্যান্য বহু ধনী আমাকে বলেছিলেন, কিন্তু সবই আমি প্রত্যাখ্যান করেছি। দরিদ্র ভারতের প্রতিনীধি আমি, আমি যাবো হিন্দুধর্ম্মের প্রতিভূরূপে, কাজেই আমার পাথেয়ের ব্যবস্থা করেছেন আমার মাদ্রাজী বন্ধু আলাসিঙ্গা পেরুমাল ও দক্ষিণভারতের জনগণ। তাদের সে ভালবাসার দান, স্নেহের দান আমি কি গ্রহণ না করে পারি? (জগমোহন উঠিয়া একধারে রক্ষিত বহুমূল্য সিল্কের আলখাল্লা ও সেইরূপ মূল্যবান পাগড়ী স্বামীজিকে দিল)

জগমোহন—গ্রহণ করুন স্বামীজি, গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন।

বিবেকানন্দ—ওকি, ওকি, আমার যেমন তেমন একটা গেরুয়া বস্ত্র আর—

জগমোহন—থাক্, আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনার যা

প্রয়োজন তা আমি জানি। তাছাড়া মহারাজের আদেশ অমান্য করবার সাহস আমার নেই। আপনি রাজগুরু—রাজগুরুর যোগ্য বেশেই আপনাকে যেতে হবে। (জগমোহন তাঁহাকে নূতন বেশে সাজাইতে লাগিল।)

মহারাজ—আর এই সামান্য অর্থও গ্রহণ করুণ। শিষ্যের ভক্তি-অর্ঘ্য গুরুর নিতে কোন দোষ নেই, এতো আর আপনার নিজের জন্যে নয়—বিদেশে দরকার হতে পারে দেশেরই কল্যাণে। (অতি করুণস্বরে লছমীবাই গান আরম্ভ করিল)

গান

লছমী— প্রভু মেরো অওগুণ চিত না ধরো
সমদরশী হ্যায় নাম তুমারো।
এক লোহ পূজামে রহত হৈ
এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।
পারশকে মন দ্বিধা নাহি হোয়
দুঁহু এক কাঞ্চন করো।

বিবেকানন্দ—(গান শেষ হইলে আপন মনে) প্রভু, আমার দোষ ধরো না। তুমি তো সমদর্শী। স্পর্শমণির অন্তর দ্বিধাহীন, সে সব লোহাকেই সোনা করে, সে পূজার ঘরের অস্ত্রই হ'ক বা ব্যাধের হাতের খড়্গই হোক্। তা হ'লে আমাকে কেন তুমি কৃপা করবে না? আমি কলঙ্কী বলে তুমি কেন কৃপণ হবে? (কিছুক্ষণ পরে) এ আমি কাকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করতে চেয়েছি? এ গায়িকা কি ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া নয়? আমার এখনও ভেদাভেদ? আমি সন্ন্যাসী

আর ও পতিতা ? এই আমার সর্ব্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি ? মা, মা,—তুমি আমায় ক্ষমা করো।

লছমী—(প্রণাম করিয়া) এতক্ষণে আপনি আমার অভিমান ভেঙ্গে দিয়েছেন স্বামীজি। বড় অভিমানে কেঁদে কেঁদে ঠাকুরকে বলছিলুম—এ কি হ'ল ? আমার কি অপরাধ ? পঙ্কে জন্ম—সেওকি আমার অপরাধ ? জন্মতো কারও অধীন নয় ? তবে কেন সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীও ঘৃণাভরে আমায় প্রত্যাখ্যান করলেন—তবে কি আমার প্রণামও দেবতা গ্রহণ করবেন না ? আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন (আবার প্রণাম)।

বিবেকানন্দ—ওঠো মা, তুমি আজ আমায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে নতুন করে শিক্ষা দিয়েছো, তুমি যথার্থই আমার মা, আমার গুরু—আমার প্রণম্য।

——

—তৃতীয় অঙ্ক—

প্রথম দৃশ্য

(বরানগর মঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যমণ্ডলী বসিয়া আছেন। গিরীশের প্রবেশ। সময় প্রভাত)

শশি—এসো গিরীশ এসো।

রাখাল—বহুদিন বাদে তুমি এদিকে এলে—

গিরীশ—আর ভাই নরেন আমেরিকা চলে যাবার পর আমার কেন যেন আর ভাল লাগে না। আমি তো আর তোমাদের মত

শুকনো কাঠ নই—আমার মধ্যে এখনও একটু আধটু মায়া মমতা আছে বই কি।

রাখাল—একথাটা তোমার ঠিক হ'ল না ভাই। সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করেছি সত্য কিন্তু মায়া মমতা কি একেবারে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব? সে কি সকলে পারে?

বাবুরাম—নরেনও পারে নি। সেবার ওর ছোটবোনের আত্মহত্যার খবর শুনে ও একেবারে ছোটছেলের মত কেঁদে সারা হলো।

গিরীশ—এ্যামেরিকা থেকে কোন চিঠি তোমরা পেয়েছো কি?

নিরঞ্জন—হাঁ, সেই একখানা চিঠি এসেছিল রাখালের কাছে।

গিরীশ—তাই নাকি? তা মহারাজ, একটু শুনতে পাই না? সিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় কি হল? এ্যামিরিকায় যেতেই নিশ্চয়ই খুব অভ্যর্থনা পেয়েছিলো?

শশি—না ভাই, ভাগ্যের দোষে প্রথমে অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে সিকাগোতে তাকে থাকতে হয়েছিল। হয়েছিল কি জান? তার পরিচয় লেখা চিঠিখানা সে হারিয়ে ফেলে এবং ঠিকানাটাও—

নিরঞ্জন—কাজেই বুঝতে পারছো বিদেশে বিভূঁয়ে কি দূরাবস্থা।

রাখাল—কোন হোটেলেই স্থান পায় নি। পয়সাকড়ি সব ফুরিয়ে গেছে—

গিরীশ—পয়সা কড়ি সব ফুরিয়ে গেল কেন?

শশি—প্রথমে সিকাগোতে গিয়ে হোটেলেই ছিল। সেখানে খুব খরচ। তাই টাকাকড়ি শেষ হয়ে আসাতে এবং ধর্ম্মমহাসভার তখনও অনেক দেরী আছে দেখে সে বোষ্টনে চলে যায়।

রাখাল—সেখানে ভাগ্যবলে এক মহিলা তাকে অতিথিরূপে গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকেই সে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়।

লাটু—কিন্তু সিকাগো ষ্টেশনে নেমেই তো চক্ষু একদোম চোড়কগাছ হইয়া গেল। চিঠিটো হারিয়ে গেছে। আউর ঠিকানভি ভুলিয়ে গেছে।

গিরীশ—তারপর—তারপর ?

শশি—তারপর দুঃখের পালা। হোটেল সব ভর্ত্তি, কোথাও ঠাঁই নেই। কেউ কেয়ার করে না যে অতিথি হবে। শেষে ষ্টেশনের ধারে এক ভাঙ্গা মালগাড়ীর মধ্যে তিন রাত্রি কাটাতে হয়।

লাটু—কিন্তু নিরুৎসাহ হোবার ছেলে তো নরেন নয়। সে রোজই হেঁটে হেঁটে সিকাগো সহরের আধখানা মেরেই দিলে। রোজ হাঁটে আর ঠাকুরের নাম করে।

গিরীশ—বাঃ, লাটুতো আজকাল বেশ বাংলা বলতে পারে। ঠাকুর বলতেন লেটো, আর নরেন আদর করে ডাকে প্লেটো।

রাখাল—হাঁ, তারপর শোন। হঠাৎ রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে যায় আবার আর এক মহিলা। তিনি তাঁর বাড়ীতে আতিথ্য দেন এবং ধর্ম্মমহাসভার উদ্যোক্তাদের চেয়ারম্যানের কাছে পৌঁছেদেন।

গিরীশ—ধর্ম্মমহাসভার বিবরণ কিছু পেয়েছো ?

রাখাল—শশি, তুমিই বল, তুমি তো বারবার পড়ে চিঠিখানা মুখস্ত করে ফেলেছো।

শশি—বেশ, আমিই বলছি। ধর্ম্মমহাসভায় প্রবেশ করে একধারে চুপ্ করে বসেছিল নরেন। কয়েকজন বক্তার বলা শেষ হচ্ছে, খুব হাততালী পাচ্ছে আর ওর বুক ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে। কেবল ঠাকুরকে স্মরণ করছে। যদিও ওর নম্বর ছিল ৩৭ কিন্তু সভাপতি তার আগেই তিনবার ওর নাম ঘোষণা করেন, নরেন তিনবারই বল্‌লে—এখনও আমার সময় হয়নি। সবাই ভাবলে--কি ব্যাপার, ঐ গৈরিক বস্ত্রাবৃত, পাগড়ী পরিহিত অদ্ভুতদর্শন যোগী কি বলতে ভয় পাচ্ছেন না কি? তারপর ওর Turn এলো। আমার যেন চোখের ওপর ভাসছে সে দৃশ্য—এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন, মনে মনে প্রণাম করলেন বাগ্‌দেবী স্বরস্বতীকে, মঞ্চাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে, নিজের গুরুকে, তারপর জলদগম্ভীরস্বরে বল্‌লেন—Sisters and brothers of America—ব্যাস্, এতেই পাঁচমিনিট ধরে হাততালী। কিছুতেই আর হাততালী থামতে চায় না। ওরা চিরকাল শুনে এসেছে—Ladies and gentlemen—তার পরিবর্ত্তে একেবারে ভাই ভগ্নী বলে সম্বোধন। আর সম্বোধন করলে কে—না প্রাচ্যদেশসমুহের অন্তর্গত এক দরিদ্র দেশের এক হিন্দু যোগী—আর সম্বোধন করছে ধনকুবেরের দেশ আমেরিকার অগন্য শিক্ষিত জনতাকে। সমগ্র জনমণ্ডলী একেবারে pin drop silence.

রাখাল—নরেন বল্‌লে—আমি এসেছি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সনাতন সবচেয়ে পুরাতন ধর্ম্মের দেশ থেকে। আমি জানাই

সমস্ত নতুন, আধুনিক ধর্ম্মকে আমার শুভেচ্ছা—প্রীতি। জৈষ্ঠ সহদরের মতই আমি অন্যান্য নবধর্ম্মকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে অন্য কোন ধর্ম্মের বিরোধ নেই। হিন্দুধর্ম্ম উদার।

লাটু—এক লেকচারেই বাজী মাৎ। তারপর সাতদিন ধরে মহাসভা বসেছিল এবং প্রত্যেকদিনই নরেনকে কিছু না কিছু বলতে হতো।

বাবুরাম—শেষে এমন হ'ল যে ওর বক্তৃতা শেষ হলেই হল্ খালি হয়ে যেতো। ওর বক্তৃতার পর আর কারও লেকচার জমতো না।

রাখাল—তখন উদ্যোক্তারা স্থির করে ঘোষণা করলেন যে বিবেকানন্দের বক্তৃতা হবে সবশেষে। ব্যাস্ আর কেউ যেতে পারে না।

গিরীশ—মহামায়া দড়ি দিয়ে দুজনকে বাঁধতে চেয়েছিলেন, এক আমাদের স্বামীজি আর এক নাগমশাই। দুজন দুউপায়ে বাঁধন কাটালে। দড়ির যা দৈর্ঘ্য তার চেয়েও স্বামীজির আয়তন বড়, যতো দড়ি জোড়েন মহামায়া ততই বেশী ফুলতে থাকে স্বামীজি, দড়িতে আর কুলালো না শেষ পর্য্যন্ত। আর নাগমশাই? নাগমশাই কেবল ছোট হয়। ক্ষুদ্রের সঙ্গে দড়ি কি করে পারবে? গ্রন্থির ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে গেল দুর্গাচরণ নাগ। একজন বেরিয়ে গেল জ্ঞানে, বীর্য্যে আরেকজন বেরিয়ে গেল ভক্তিতে, দীনতায়। (কেবলরামের প্রবেশ)

কেবলরাম—আমাগো নাগমশাই এর কথা কি কইছো ?

লাটু—আরে এসো এসো কেবলানন্দ, অনেকদিনবাদে এদিকে তোমার আসা হ'ল।

কেবলরাম—কেবলানন্দ নই, আমি শুধু ক্যাবলরাম। তোমাগো মত আমি সন্ন্যাসী নই, তাই আমি আনন্দটানন্দ নই। তোমরা যেমন কেউ বেঁটে আনন্দ, কেউ লম্বোদরানন্দ, কেউ মেদানন্দ, কেউ লম্বানন্দ, কেউ ঘুড়িআনন্দ, কেউ লাটুআনন্দ। ও সব আনন্দ আমার জন্য নয়—আমার জন্য ঠাকুর রাখছেন কেবল দুঃখ।

শশি—তোমার কিসের এত দুঃখ ভাই ?

কেবলরাম—আমার দুঃখ তোমরা কি বুঝবা সন্ন্যাসী ঠাকুরের দল ? আমাগো হ্যাবতাও হ্যাশে নাই কারেই বা কই।

গিরীশ—তোমার কি দুঃখ বলো, আমি কিন্তু সন্ন্যাসী নই।

কেবলরাম—তুমি শুনবা গিরীশবাবু ? দেখো শেষকালে আবার আমাকে লইয়া একটা যাত্রাটাত্রার পালা লিখে দিও না যেন। তোমরা তো জানো না ঠাকুর দেহ রাখবার পর অনেকদিন ঠাকুরকে ডাকবার পর, ঠাকুরের কৃপায় একটা ছ্যাওয়াল হ'ল আমার। কি সুন্দর দেখতে, যেন স্বয়ং কৃষ্ণ এ্যালেন গরীবের ঘরে। আমার স্ত্রীতো সব কাজকর্ম্ম ফেলে—এমন কি ঠাকুরের পূজাপাঠ ভুলে গিয়ে দিনরাত সেই ছ্যাওয়ালকে নিয়ে থাকে। কিন্তু এ সুখ সইবে কেন ? একমাস বাদেই হঠাৎ একদিন ছ্যাওয়ালডা আমাগো মায়া ছাড়িয়া সরে পড়লো। সেই হতে আমার স্ত্রী (দুঃখে গলার স্বর বাহির হইল না।)

বাবুরাম—কি হল তোমার স্ত্রীর ?

কেবলরাম—আমার স্ত্রী—আমার স্ত্রী একেবারে পাগল হইয়া গেল। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ—আজ তিনদিন হ'ল সে ঘরের বাইর হইয়া কুথায় চলে গেছে। আমিও পথে পথে তার খোঁজ করে ঘুরে মরছি। ঠ্যাবতা নাই, কে আমাকে পথের সন্ধান দিবা ? গিরীশবাবু, তুমি তো অনেক জায়গায় ঘুইরা বেড়াও তুমি একটা ব্যবস্থা কইরা দাও। তোমার পায়ে পড়ি বাবু-মশাই গো। আমি এই সাধুবাবাদের সামনে পতিজ্ঞা করছি, আর কখনও ওর সঙ্গে ঝগড়া করমু না (পদধারণ)। এই আমি নাক কান মুলছি। তারে ফিরায়ে আনি ঠ্যাও বাবুমশাইগো।

গিরীশ—ওঠো ভাই। আমি কি করতে পারি ? ঠাকুরের নাম কর। তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন।

সকলে—জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ। (এমন সময় আলুথালু-বেশে পাগলিনী ক্ষান্তমণির প্রবেশ। তাহার কাপড়চোপড় ছেঁড়া-ময়লা, আঁচল ধূলায় লুটাইতেছে, চুলে জট পড়িয়াছে। দেহ শীর্ণ।)

ক্ষান্তমণি—আমার গোপাল কোথায় ? একি এখানে এতো ভিড় কেন ? আচ্ছা তোমরা দেখেছো—দেখেছো আমার গোপালকে ? বাছা আমার যে এখনও দুধ খায় নি। কোথায় গেল বলো তো ? সে কি খেলা করতে গেছে ? পথে পথে কত খুঁজছি কিন্তু তবু তো তার দেখা পাচ্ছি না। তোমরা কেউ দেখেছো আমার গোপালকে ? কি সব চুপ্

করে যে ? ও তোমরা তাকে দেখোনি তাহলে। তবে আমি যাই—সে বড় কাঁদছে—কেঁদো না পোপাল। এই যে আমি যাচ্ছি। (প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে কেবলরাম চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহার হাত ধরিল।)

কেবলরাম—গিন্নী ও গিন্নী, কোথায় যাইবা তুমি ? এই তোমার হাতে ধইরা কইতাছি আর আমি কখনও তোমার সঙ্গে ঝগড়া করমু না। তুমি স্থির হও ঘরে চলো।

ক্ষান্ত—ঘর—আমার আবার ঘর কোথায় ? তুমি বুঝি জানো না, গোপাল যে আমার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কেমন ক'রে ঘরে যাবো ? তাছাড়া তুমি কেমনধারা মানুষ গো ? মেয়েমানুষের হাত ধরেছো ? ছাড় বলছি। আমি এখনই চেঁচিয়ে লোক জড়ো করবো বলছি। এইতো এখানে এতো লোক রয়েছো, তা তোমরা কেউ কিছু বলছো না একে ? তোমরা কি সবাই গুণ্ডা নাকি ? ছাড়ো ছাড়ো শীগ্‌গীর, আমার গোপাল যে কাঁদছে।

কেবলরাম—গিন্নী, তোর দুটি পায়ে পড়ি ঘরকে চল। আমি আর তোকে কিছু বলবো না। আর আমি তোর সাথে ঝগড়া করমু না রে। তুই আমার সাথে চলরে। ঠাকুরমশাইরা, তোমরা এর একটা ব্যবস্থা করো দয়া করে। তা নাহলে ওযে মইর‍্যা যাবে—না খাতি পেয়ে মইর‍্যা যাবে।

রাখাল—একে মার আশ্রয়ে রেখে আসাই যুক্তিযুক্ত। মার করুণায় নিশ্চয়ই সেরে যাবে। লাটু, ভাই, তুমি এদের দুজনকে সঙ্গে করে জয়রাম বাটিতে নিয়ে মার কাছে রেখে এসো। মা, মা তারা ব্রহ্মময়ী !

ক্ষান্ত—কি বললে? মার কাছে যাবো? আমার আবার মা কোথায়? আমার মা তো কবেই মরে গেছে। তা তোমারাই বা জানবে কেমন করে? আমারও তো মনে পড়ছে না কোথায় যেন আমাদের দেশ ছিল। কিন্তু গোপাল তো বড্ড ছোট, ও তো আমাকে মা বলতে পারে না। তাহলে কি মজা হবে? বাঃ বাঃ, আমারও মা আছে— আমিও মা মা বলে ডাকবো। আমি মার কাছে যাবো। তুমি (কেবলরামকে) চলো না, আমাকে মার কাছে নিয়ে চলো না, নিশ্চয়ই আমার গোপাল সেখানে আছে।

(ক্ষান্তমণি, কেবলরাম ও লাটুর প্রস্থান)

গিরীশ—এসেছিলুম নরেনের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে কিন্তু কেবলরামের স্ত্রীকে দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। এ সময় নরেন থাকলে হয়তো ওর একটা হিল্লে হয়ে যেতো। সে যে কবে ফিরবে? আচ্ছা নরেন কি এখনও এ্যামিরিকায় আছে? তার আর কোন চিঠিপত্র পেয়েছো?

শশি—না ভাই, আর কোন খবর আমরা পাইনি।

গিরীশ—আমি কিন্তু চুপ্ করে বসে নেই। আমি কয়েকদিন আগে আমার বন্ধু টমাস্‌কুক্ এণ্ড সন্‌সের ক্যাশিয়ার কালীকৃষ্ণ দত্তের কাছে গিয়েছিলুম।

রাখাল—তিনি কি করবেন?

গিরীশ—আরে শোনই না। তাকে বলতে সে তখনি তার হেড্ অফিসে চিঠি লিখে দিলে। লিখলে—শুনতে পাওয়া যাচ্ছে এ্যামেরিকায় বিবেকানন্দ ঝড় তুলেছেন। যেখানেই গিয়েছেন

সেইখানেই বক্তৃতা দিয়ে মাতিয়েছেন জনগণকে। সে সব ভ্রমন ও বক্তৃতার বিস্তৃত বিবরণ কিছুই আসছে না এদেশে। আপনারা যদি একটু কষ্ট করে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে পাঠান তাহলে তাঁর স্বদেশবাসীরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে আপনাদের কাছে। আমার বিশ্বাস চিঠির জবাব দু-একদিনের মধ্যেই এসে পড়বে।

রাখাল—বিস্তারিত খবর এদেশে না এলেও যেটুকু এসেছে তাতেই লোক বুঝতে পেরেছে বিবেকানন্দ বিশ্বজয় করেছে। লোকে বুঝতে পেরেছে যে তিনি এ্যামেরিকাতে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব-পতাকা উড্ডীন করেছেন। মুখোজ্জ্বল করেছেন হিন্দুর, তার দেশের, তার ধর্ম্মের, তার ঐতিহ্যের।

শশি—শুনছি ভারতবর্ষের চারিদিক থেকেই বিবেকানন্দকে অভিনন্দন পাঠান হচ্ছে। রামনাদের রাজা ভাস্কর সেতুপতি পাঠালেন জয়পত্র। খেতুড়ীর রাজা দরবার বসালেন, সম্বর্দ্ধনা করলেন স্বামীজির। মাদ্রাজের গন্যমান্যরাও শুনছি সভা করেছেন।

রাখাল—কিন্তু আমরা কলকাতাবাসী, তার জন্মস্থানবাসীরা কি করলুম ?

গিরীশ—আরে তোমরা দেখছি কিছুই জানো না। কাল ৫ই সেপ্টেম্বর টাউনহলে বিরাট সভা হবে। সভাপতি হবেন রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান বক্তা। আমার ওপর ভার পড়েছে অভিনন্দন পত্র লিখে দেবার।

বাবুরাম—আরে বলো কি? এ কথাটাই এতক্ষণ বলো নি? যোগ্যপাত্রেই ভার দেওয়া হয়েছে। তা তুমি কি তোমার নাটুকে ছন্দে অভিনন্দন লিখেছো না কি? পড় পড় কি লিখেছো অভিনন্দনপত্রে।

গিরীশ—কালই শুনতে পাবে। তখন দেখো ঠিক হয়েছে কি না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(লণ্ডনে স্বামীজির আবাসস্থল। শরৎ বা স্বামী সারদানন্দ ও মহেন্দ্র দত্ত। একপাশে একটি খাট, খাটে বিছানা ও কম্বল, মহেন্দ্র খাটে শুইয়া আছে। সারদানন্দের গায়ে পার্শ্বীকোট বা লংকোট ও প্যাণ্ট। সময় অপরাহ্ন)

শরৎ—ওহে মহিম্, একবার ঠ্যাং তুলে বসলে হয় না? আর তো পারি না। চব্বিশঘণ্টা আটেকাটে বন্ধ থাকা। একি আমার সাধ্যি? অষ্টবজ্রে বন্ধন করে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা! এ বাপু নরেনের সাধ্যি, নরেন করুক গে। নরেনের হাপরে পড়ে প্রাণটা আমার গেল। কোথায় বাড়ী ছাড়লুম মাধুকরী করবো, নিরিবিলিতে জপধ্যান করবো, না হাপরে ফেলে দিলে। না জানি ইংরেজী, না জানি কথাবার্ত্তা কইতে, অথচ আদেশ হচ্ছে, লেক্চার দাও—লেক্চার দাও। আরে বাপু, আমার পেটে কি কিছু আছে? আবার নরেন যা রাগী হয়েছে আজকাল কোন্দিন মেরে বসবে। তা চেষ্টা করবো দাঁড়িয়ে উঠে যা আসবে তাই একবার বলবো। যদি হয়তো ভাল। না হয় চোঁচা মারবো, একেবারে দেশে গিয়ে উঠবো। সাধুগিরি করবো সে আমার ভাল। কি উপদ্রবেই

না পড়েছি! এমন জানলে কি এখানে আসতুম্? শুধু নরেনের অসুখ শুনেই না এলুম।

মহেন্দ্র—আচ্ছা দাদা, এই গুড্‌উইন্ ইংরেজের ছেলে ও কেমন করে স্বামীজির এমন ভক্ত হয়ে উঠলো? ও জুটলোই বা কেমন করে?

শরৎ—ও সে বুঝি জানো না? আমি একদিন নরেনকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। নরেন বল্‌লে—এ্যামেরিকায় প্রথম এমনি এমনি বক্তৃতা দিতুম, কেই বা লেখে, কেই বা খবর রাখে? শেষে সকলে জিদ্ করলেন যে এমন সব সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এগুলি লিখে রাখা ভালো—সেইজন্যে খবরের কাগজে একজন ষ্টেনোগ্রাফারের জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। অনেক এ্যামেরিকান applicant এর সঙ্গে একজন মাত্র ছিল ইংরেজ। সে গিয়েছিলো সিকাগোতে এবং কাগজে কাগজে রিপোর্ট দিয়েই তার দিন চলতো। তাকেই রাখা হ'ল। প্রথম প্রথম সে অন্য জায়গায় থাকতো এবং অন্যজায়গায় খেতো। সপ্তাখানেকপরে সে স্বামীজির খুব অনুগত হয়ে গেল, টাকা পয়সা নিতো না, ওর সঙ্গেই থাকতো এবং সব কাজকর্ম্ম করতো। নরেন ইংলণ্ডে এলেও ও এখানেই রয়ে গেল, নিজের বাড়ী গেল না।

মহেন্দ্র—আমি তো আর পারছি না দাদা, জ্বরটা খুবই বাড়ছে। খুব কষ্ট হচ্ছে।

শরৎ—এই আমাদের এক ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে। কখন যে আসবে তার কিছুই ঠিক নেই। আমি তো এতক্ষণ বেশ

ছিলুম এইবার আমরাও একটু একটু জ্বর আসছে। (গুড্-উইনের ব্যস্তভাবে প্রবেশ)

গুড্উইন্—May I come in?

শরৎ—Yes, come in.

গুড্উইন—তোমরা এখন কেমন আছ তাই দেখতে এলুম। স্বামীজি পাঠিয়ে দিলেন।

শরৎ—আমার জ্বর আসছে আর মহিমের তো খুব জ্বর—কোঁতাচ্ছে।

গুড্উইন্—(গুড্উইন মহেন্দ্রর কপালে হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া) তাইতো জ্বরটা খুবই বেশী মনে হচ্ছে। (শরৎকে) You Cooky Swami, Devil Swami, Blacky Swami, [তুমি চোখ বুজে বুজে কেবল ধ্যান করো আর ভাবো যে কখন খাবার আসবে, কখন খাবার ঘণ্টা বাজবে।] তোমাকে একটা খবর দি, আজ স্বামীজি আমাদের জন্য কি একটা Indian রান্না করিয়াছেন। হাঃ হাঃ—যাই এবার, স্বামীজি আবার ওর জ্বরের জন্য ব্যস্ত আছেন। (প্রস্থান)

শরৎ—দেখো মহিম্, নরেনতো ছাড়বে না, যে কোন প্রকারেই হউক লেকচার দেওয়াবেই। তা এখন তো আর এখানে কেউ নেই, এখন লেকচার রিহার্সাল দি। কিন্তু তুমি মাঝে মাঝে হুঁ দিও। এদিকে আমার জ্বরটাও বাড়ছে। (ঘরময় পদচারণা করিতে করিতে) The subject of my lecture, ladies and gentlemen, of course I have got nothing to say (জ্বরের ঝোঁকে এই কথাই বারবার বলিতে লাগিল) মহিম্ শুনছো তো, হুঁ দাও।

মহেন্দ্র—(অতিকষ্টে) হুঁ। উঃ উঃ, আমি আর পারছি না। আমি বেশ টের পাচ্ছি শরীরের উত্তাপটা শরীরের একেকটা স্থানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে—একবার পা থেকে ওপরের দিকে ওঠবার চেষ্টা করছে আবার পায়ের দিকে নেমে যাচ্ছে। উঃ, একি যন্ত্রণা—মনে হচ্ছে যেন জ্বরের সঙ্গে কার যুদ্ধ হচ্ছে—একবার ওপরে উঠছে আবার নেমে যাচ্ছে। আঃ আঃ মরে গেলুম, বুকের মাঝে এসে যন্ত্রণাটা আটকে গেছে —আঃ আঃ (মুর্চ্ছা)

শরৎ—The subject of my lecture (ইত্যাদি জ্বরের ঝোঁকে বলিতে বলিতে শুইয়া পড়িয়া কম্বল মুড়ি দিয়াও বলিতে লাগিল। এমন সময়ে ধীরপদে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবেশ করিয়া তাহাদের মাথার দিকে দাঁড়াইলেন)

নরেন—(মহেন্দ্রকে) কি রে তোর জ্বর ছেড়েছে ?

মহেন্দ্র—হাঁ জ্বর ছেড়েছে।

নরেন—হাঁ জ্বর ছেড়ে গেছে। আর কুইনাইন্ খাসনি। জ্বরকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কি রে শরতা, জ্বর হুকুম শোনে না ? আমি নীচে চেয়ারে বসে বসে will force দিচ্ছিলুম, জ্বরকে বের করে দিলুম। জ্বর হুকুম মানবে না ? (স্বামীজি কখনো টেবিলের নিকট দাঁড়াইতেছিলেন কখনো বা পদচারণা করিতেছিলেন। শরতের তখন তন্দ্রা কাটিয়া গিয়াছে। তড়াক্‌করে মেঝেতে নামিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া স্বামীজির পা জড়াইয়া বালকের মত কাঁদিতে বলিল)

শরৎ—আমার মনটা ভালো করে দাও, এটাকে উপড়ে তুলে দাও।

নরেন—দূর শালা হোঁৎকা, উঠে বোস্। শালার ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছে কি না তাই বাতিকে কি করছে দেখো। যা শালা, তোকে লেকচার দিতে হবে, না হ'লে তোকে মারবো লাথি, আর এই চারতলার জানলা থেকে রাস্তায় ফেলে দোব। শালা, তোকে work house এ খাটাবো। জানিস্ না কতো খরচ হচ্ছে ?

শরৎ—তুমি লাথিই মারো আর যা ইচ্ছে করো। কিন্তু আমার মন ভালো করে দাও—দাও, তা নাহলে তোমায় ছাড়বো না।

নরেন—(হাসিতে হাসিতে) তা শালা হবে। এখন ওঠ্। ছ্যাখ্, ডাইনিংরুমের যে চেয়ারে আমি বসি, সেইখানে বসে আমি শক্তি সঞ্চার করছিলুম। শালা শক্তিসঞ্চার জানিস্ তো ? এই দেখ্লি তো তোদের চোখের সামনেই করলুম।

শরৎ—তা করেছো, বেশ করেছো, আমার মন ভাল করে দাও।

নরেন—(মহেন্দ্রকে) যা আর কুইনিন্ খাসনি, বাক্সো থেকে সব টেনে ফেলে দে। উইল্‌ফোর্স বা শক্তিসঞ্চারে সব হয়। আজ রাত্রে রুটি খাস্‌নি দুধসাগু খাস্ (বলিতে বলিতে প্রস্থান)

শরৎ—ওহে সে নরেন আর এখন নেই, এই তো হাতে হাতে দেখলুম। হুকুমে তো এতো বছরের জ্বর একদিনে একেবারে তাড়িয়ে দিলে। এখন বুঝেসুঝে কথা বলা ভাল। (গুড্‌উইনের প্রবেশ)

গুড্‌উইন—আঃ, আজ কি সুন্দর রান্না করিয়াছেন স্বামীজি। আজ Cooky Swami রান্না করে নাই তাই এতো সুন্দর হইয়াছে।

শরৎ—(লাফাইয়া উঠিয়া) কি কি রান্না হয়েছে:?

গুড্‌উইন—পোটাটোর তরকারী, ভাত আর ওলন্দা কড়াইয়ের মটর ডাল—উহাতে কারি পাউডার ও মাখন দিয়া সে কি চমৎকার হয়েছে। আমি এ রকম জিনিস খাইয়া সারা জীবন থাকিতে পারি। আহা কি সুন্দর জিনিস।

মহেন্দ্র—(হাসিয়া) হায়রে কপাল্‌, এখানেও মটরডাল সেদ্ধ!

শরৎ—আচ্ছা গুড্‌উইন, আজ কতদিন তুমি গোঁফ কামাওনি? বেশ গোঁফ উঠেছে তো।

গুড্‌উইন্‌—(গোঁফে হাত বুলাইতে বুলাইতে আনন্দের সহিত) A painter will give me ten pounds to make this a model.

মহেন্দ্র—Yes, it would be a pair of very nice broom—একজোড়া ঝাঁটার বেশ নমুনা হতে পারে। (সকলেই হাসিয়া উঠিল। ঠিক এই সময়ে বিবেকানন্দ মার্গারেটকে লইয়া প্রবেশ করিল।)

নরেন—এসো মার্গারেট, তোমার লজ্জা করবার কিছু নেই। আমার তো বেশী ঘর নেই। এই ঘরেই এরা শোয় আর আমরা বসি। গুড্‌উইন্‌কে তো তুমি চেনো। আর ইনি স্বামী সারদানন্দ আমার বন্ধু আর এ মহেন্দ্র এদেশে পড়তে এসেছে।

মার্গারেট্‌—নমস্কার, আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই সুখী হয়েছি। স্বামীজি, আজ সাতদিন ধরে যেখানে আপনার বক্তৃতা হয়, যেখানে ঘরোয়া আলোচনা সভা হয় সব জায়গাতেই আমি গিয়েছি। আপনার বক্তৃতার অর্থগ্রহণ করবার চেষ্টা করেছি। নিজে আমি স্কুলটিচার, শিক্ষা দেওয়া আমার পেশা

এবং নেশা দুইই। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে আমি লজ্জা বোধ করছি যে আপনার বক্তৃতার বিষয়বস্তু সমস্ত উপলব্ধি করতে পারি না। নানা জিজ্ঞাসা আমার অন্তরকে পীড়ন করে।

শরৎ—আমাদের গুরুদেবও বলতেন—যতক্ষণ না নিজে ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারো ততক্ষণ তাকে গ্রহণ কোর না।

মার্গারেট—ছোটবেলা থেকেই এই আমার বদ অভ্যাস। আজ মনে পড়লে হাসি পায়। কত রকম অদ্ভুৎ প্রশ্নই না বাবা মাকে করতুম। একদিন জিজ্ঞেস করলুম—আগুণ কেন লাল? আমার মা খুবই বিরক্ত হতেন কিন্তু বাবা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। এই একই অভ্যাসের জন্য স্কুলে কত বকুনী খেয়েছি—টিচাররা কত বিরক্ত হয়েছেন। বিজ্ঞানের ছাত্রী আমি, চুলচেরা বিচার না করে ক্ষান্ত হতে পারি না।

গুড্ উইন্—তোমার কি জিজ্ঞেস করবার আছে স্বামীজিকে জিজ্ঞাসা করতে পারো মিস্ নোবল্।

মার্গারেট—আমি শৈশব থেকে শিক্ষা পেয়ে এসেছি—বিশ্বাস করো এবং অগ্রসর হও। বিশ্বাসই দেবে তোমাকে পথের সন্ধান, বিশ্বাসই নিয়ে যাবে তোমাকে পরমপিতার কাছে। কিন্তু আপনি বোল্‌লেন—আত্মানং বিদ্ধি, আত্মাকে উপলব্ধি করো—নিজেকে জানো। নিজেকে না জানলে কোন জানাই সার্থক হবে না জীবনে। এ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

নরেন—একই দীপশিখা হ'তে জ্বলে ওঠে কোটি কোটি দীপশিখা—শিখায় শিখায় সেই একই শক্তি। তেমনি প্রাণে প্রাণে চলছে

সেই একই অনন্ত শক্তির লীলা। দেহ কি? সে তো শুধু আত্মার বহিরাবরণ—আত্মার প্রয়োজনেই দেহ। আত্মাই বারবার দেহান্তর গ্রহণ করে। গীতা বলেছেন—

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ ন শোষয়তি মারুত॥'

এই আত্মা অবিনশ্বর—অক্ষয় অমর। অস্ত্রশস্ত্র পারে না তাকে ছেদন করতে—আগুণ পারে না তাকে দহন করতে, জলে উত্তাপে বায়ুতে সে লয় পায় না দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ নেই—সাপের খোলসের মত তোমার জীর্ণ-দেহও খসে পড়ে যাবে—আবার আত্মা গ্রহণ করবে নবদেহ।

মার্গারেট—আপনি কি মনে করেন স্বামীজি যে জগতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ সেই একই নিয়ন্তার অধিনে চলছে?

নরেন—জগতের বিরাট এবং ক্ষুদ্র সকল বস্তুর অণুপরমাণুতে সেই একই ব্রহ্মসত্তারই ক্রিয়া চলছে—সেই এক ব্রহ্মশক্তিই পরিব্যাপ্ত রয়েছে—আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, বৃক্ষলতায়, পর্ব্বতে কন্দরে, বনে—মরুভূমিতে, এবং বৃহৎ থেকে অতি ক্ষুদ্র—চক্ষুর অগোচর প্রতিটি জীবের মধ্যে—'সোহহং'।

মার্গারেট—আমার মন অশান্ত অধীর হয়ে উঠছে—অনন্ত আকুল জিজ্ঞাসায় এবং অতৃপ্ত পিপাসায়। আমি কিছুতেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছি না। মনে হচ্ছে যেন কিছু করি—ছুটে চলে যাই—(বিবেকানন্দ স্নেহভরে তাহার মাথায় হাত দিয়া)

নরেন—শান্ত হও। শান্ত হও বৎসে। আমি এনে দেব তোমার অশান্ত পিপাসায়িত মনে শান্তি। নিবৃত্তি এনে দেবো তোমার পরম অন্তরক্ষুধার। ধীরে-ধীরে বৎসে। তুমি শুধু একান্ত সংযমে—গভীর নিষ্ঠায় এগিয়ে চলো কঠোর সাধনার দিকে।

গুড্‌উইন্—Excuse me Swamiji for intrapting you. আপনি আপনার দেশের সম্বন্ধে কিছু বলুন তাহলে Miss Noble খুব enjoy করতে পারবেন।

মার্গারেট—খুব ছোটবেলায় ভূগোলের পাতায় পৃথিবীর ম্যাপ্ দেখাতে গিয়ে বাবা দেখালেন একটা দেশ, নাম বললেন ভারতবর্ষ। কেন জানি না আমার মনে হ'ল সে দেশটা খুবই সুন্দর, সে দেশের সঙ্গে যেন আমার কিসের সম্বন্ধ আছে। সে দেশ আমাকে দেখতেই হবে।

নরেন—সত্যিই মার্গারেট, আমার দেশ খুবই সুন্দর। কতো তার তীর্থস্থান, কতো দেবমন্দির। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি অযোধ্যা, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরা-বৃন্দাবন-দ্বারকা, বুদ্ধদেবের লুম্বনী, আর শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বর—সবই আমার ভারতে। ভারতের প্রতি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র।

মার্গারেট—কিন্তু লণ্ডনের মতো শহর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। যেমন সুন্দর—তেমনি শিক্ষা সভ্যতা ও শিল্পসম্পদের কেন্দ্র।

নরেন—হাঁ, নিশ্চয়ই, স্বীকার করি তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। অতুলনীয় শহর তোমাদের লণ্ডন। কিন্তু ভুলে যাচ্ছো কেন—

তোমাদের এই শহরকে সুন্দর করবার জন্যে—তোমাদের আকাঙ্ক্ষার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার আগুনে—কত দেশের কত নগর পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। দরিদ্র ইংরেজ—সাম্রাজ্য-গ্রাসী ইংরেজ ভারতের সমস্ত সম্পদ, সমগ্র ধনরাশী নিয়ে এসেছে তার নিজের দেশে। শোষণ করেই ক্ষান্ত নয় ইংরেজ, হতভাগ্য ভারতের ওপর চালাচ্ছে তার শাসনের চাবুক।

মার্গারেট—ক্ষমা কোরবেন স্বামীজি। আমি ভারতকে হেয় করবার জন্য ও কথা বলিনি। আর তাছাড়া আপনি বোধহয় জানেন না যে আমি ইংরেজ নই। আপনার মতো এক পরাধীন জাতের মেয়ে। আমি আইরিশ। তবে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি—আয়ারলাণ্ডও শীঘ্রই স্বাধীন হবে—ভারত শীঘ্রই স্বাধীন হবে।

শরৎ—গুড্‌উইন্, তুমি তখন থেকে ও কাগজটা নিয়ে কি নাড়াচাড়া করছো ?

গুড্‌উইন্—এটা স্বামীজি এক কবিতা লিখেছেন, 'সং অফ্ দি সন্ন্যাসিন্'।

নরেন—ওহো ওটা কাল রাত্রে লিখেছি। তোরা শুনিস্‌নি। আচ্ছা শোন্, মার্গারেট, তুমিও শোন।

মার্গারেট—আপনি কবিতাও লেখেন ?

নরেন—আগে শোনই না।

"ধরো সেই গান। যে গানের জন্ম দূর দূরান্তে,
যেখানে পার্থিব মালিন্য পৌঁছতে পারে না,
পর্ব্বতগুহায়, গহন বনের বিস্তারে,

কামনা বা বৈভব বা নামাকাঙ্খার দীর্ঘশ্বাস
ছুঁতে পারে না যার শান্তির গাম্ভীর্য্য,
যেখানে বয়ে চলেছে নিত্য জ্ঞানের নির্ঝর,
যার সহচর দুই শাখা, সত্য আর আনন্দ—
সেই গান তোলো এবার উচ্চ রোলে, হে দৃপ্ত সন্ন্যাসী,
আর বলো, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ ॥”

মার্গারেট—চমৎকার, চমৎকার ! স্বামীজি, আমাকে আপনার সঙ্গে আপনার দেশে নিয়ে চলুন। ভারতবর্ষকে আমি দেখতে চাই, চিনতে চাই, সেবা করে ধন্য হতে চাই।

নরেন—কি কাজ তুমি করবে ?

মার্গারেট—আমি শিক্ষয়িত্রী। আমার শিক্ষা দীক্ষা, জ্ঞান গরিমা সবকিছুই আমি নিয়োজিত করতে চাই ভারতীয় নারীর উন্নতির জন্য। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন, আমাকে আপনার পাশে স্থান দিন—আপনার কাজ আমাকেও করতে দিন।

নরেন—(পদচারনা করিতে করিতে দাঁড়াইয়া) না তা হয় না (স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে একবার দেখিয়া) সময় যখন আসবে আমি নিজেই তোমাকে ডাক্ দেব। (ধীরে ধীরে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[(আলমোড়ায় রামকৃষ্ণ আশ্রম। ঘরের জানালা দিয়া হিমালয়ের তুষার শুভ্ররূপটি দেখা যাইতেছে। একদিক হইতে সাধু নাগমহাশয় ও অন্যদিক হইতে গুড্উইনের প্রবেশ। সময় প্রভাত।)

নাগমশাই—নরেন, নরেন।

গুড্‌উইন্‌—কে ? আপনি কাকে খুঁজছেন ?

নাগমশাই—নরেন, নরেন কোথায় ?

গুড্‌উইন্‌—নরেন ? নরেন কে ? নরেন বলে তো কেউ এখানে থাকে না।

নাগমশাই—নরেন দত্ত।

গুড্‌উইন্‌—আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন, এখানে ও নামে কেউ নেই।

নাগমশাই—সে কি ! আমি যে এইমাত্র দেখলাম, ঘোড়ায়চড়ে নরেন এখানে ঢুকলো। ঐ রাজপুত্রের মতো চেহারা নরেন্দ্র ছাড়া আর কে হতে পারে ? আরও দেখলাম, একজন সাহেব তার ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে নামতে সাহায্য করলে। আর তারপর সে এই বাড়ীতে ঢুকলো।

গুড্‌উইন্‌—আপনি কি স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলছেন ?

নাগমশাই—ওসব বিবেকানন্দ টিবেকানন্দ অমি বুঝি না—আমি জানি নরেনকে--শ্রীরামকৃষ্ণের নরেনকে—নরেন, (বিবেকানন্দের প্রবেশ)

নরেন—কে ডাকলে আমাকে ? ও নাম ধরে কে ডাকছে ? একি সাধু নাগমশাই ! আপনি এখানে ? (প্রণাম করিল)

নাগমশাই—এই আপনাকে দর্শন করতে এলাম। সাক্ষাৎ শিব দর্শন হ'ল। জয় শঙ্কর। জয় শঙ্কর !

নরেন—আপনার শরীর কেমন আছে ? (নাগমশাই দাঁড়াইয়া রহিলেন, বসিলেন না)

নাগমশাই—ছাই হাড়মাসের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন ? আপনার

দর্শনে আজ ধন্য হলাম, ধন্য হলাম (বলিতে বলিতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন)

নরেন—আহা, আহা একি করছেন? আপনি বয়োজেষ্ঠ, তাছাড়া ঠাকুরের গৃহী সন্ন্যাসীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। আপনিই তো আমার প্রণম্য।

নাগমশাই—আমি দিব্যচক্ষে দেখছি—আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জয় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। (স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন)

নরেন—কি দেখছো গুড্উইন্? দেখো, ঠিক ঠিক ভক্তিতে মানুষ কি হয়। নাগমশাই তন্ময় হয়ে গেছেন—দেহবুদ্ধি একেবারে গেছে। এমনটি আর দেখা যায় না। ইনি গেরস্ত বটে, কিন্তু জগৎটা আছে কি না সে বোধ নেই, সর্ব্বদা তন্ময় হয়ে আছেন। তুমি যাও সব ব্রহ্মচারী ভায়েদের পাঠিয়ে দাও—তারা নাগমশাই-এর পদধূলি গ্রহণ করুক। আর অমনি এঁর জন্যে প্রসাদ পাঠিয়ে দাও। (গুড্উইনের প্রস্থান)

নাগমশাই—প্রসাদ—প্রসাদ! আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ষুধাদূর হয়ে গেছে। (কয়েকজন ব্রহ্মচারী আসিয়া প্রবেশ করিল)

নরেন—এই সব ব্রহ্মচারী ও আমাদের সকলকে ঠাকুরের কথা কিছু শোনান।

নাগমশাই—ও কি বলেন? আমি কি বলবো? আমি শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি। ঠাকুরের লীলার সহায় মহাবীরকে—মহাবিপ্লবীকে দর্শন করতে এসেছি। ঠাকুরের

কথা এখন লোকে বুঝবে। জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! জয় শ্রীরামকৃষ্ণ!

নরেন—আপনিই তাঁকে ঠিক চিনেছেন। আমরা ঘুরে ঘুরে মলুম।

নাগমশাই—ছিঃ ছিঃ। এ কি কথা বলছেন? আপনি তো ঠাকুরের ছায়া—এ পিঠ্ আর ও পিঠ্। যার চোখ আছে সে দেখুক্।

নরেন—বোধহয় শুনেছেন বেলুড়ে একটা মঠ করা হয়েছে। মিসেস্ বুল্ ও আমার আর একজন এ্যামেরিকান শিষ্যার অর্থানুকুল্যে ঠাকুরের নামে এই মঠ হয়েছে। আচ্ছা নাগমশাই, এই যে মঠ ফঠ হচ্ছে, এ কি ঠিক হচ্ছে?

নাগমশাই—আমি ক্ষুদ্র, আমি কি বুঝি? আপনি যা করবেন, নিশ্চয়ই জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।

নরেন—আপনি মঠে এসে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা কতো জিনিস শিখবে।

নাগমশাই—ঠাকুরকে ঐ কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাতে তিনি বলেন—গৃহেই থেকো। তাই গৃহেই আছি, মধ্যে মধ্যে আপনাদের দেখে ধন্য হয়ে যাই।

নরেন—আমি একবার আপনাদের দেশে যাবো।

নাগমশাই—আহা, এমন দিন কি হবে? আপনার পায়ের ধূলো পড়লে দেশ কাশী হয়ে যাবে—কাশী হয়ে যাবে। সে অদৃষ্ট কি আমার অদৃষ্টে হবে? আমি কি দেখে যেতে পারবো?

নরেন—আমার তো ইচ্ছে আছে। এখন ঠাকুর নিয়ে গেলে হয়।

নাগমশাই—আপনাকে কে বুঝবে—কে বুঝবে? দিব্যদৃষ্টি না

খুললে তো চিনবার জো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছেন। আর সকলে তাঁর কথায় বিশ্বাস করে মাত্র। কিন্তু কিছু বোঝে না।

নরেন—এখন আমার একটি ইচ্ছে আছে, শুধু দেশকে জাগানো। সমস্ত দেশটা বৃহৎ অজগরের মতো আপনার শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়ে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই—যেন মরেই গেছে। যদি একবার কোনরূপে তাকে জাগিয়ে তার সনাতন ধর্ম্মের মধ্যে কি শক্তি আছে জানিয়ে দিতে পারি, তবেই বুঝবো ঠাকুর ও আমাদের আসা বৃথা হয় নি। শুধু এই একটিমাত্র ইচ্ছে আছে—মুক্তি ফুক্তি এর কাছে তুচ্ছ। আশীর্ব্বাদ করুন যেন কৃতকার্য্য হই।

নাগমশাই—ঠাকুর আপনাকে নিয়ত আশীর্ব্বাদ করছেন। আপনার ইচ্ছার গতিরোধ করে কে? যা ইচ্ছে করবেন—তাই হবে।

নরেন—কই কিছুই হয় না—তাঁর ইচ্ছে ভিন্ন কিছুই হয় না।

নাগমশাই—তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হয়ে গেছে। আপনার যা ইচ্ছা, তা ঠাকুরের ইচ্ছা। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

নরেন—কাজ করতে গেলে মজবুত শরীর চাই। এই দেখুন এদেশে এসে অবধি শরীর ভাল নেই, ও দেশে বেশ ছিলুম।

নাগমশাই—ঠাকুর বলতেন—দেহে থাকতে হলে টেক্স দিতে হয়। রোগ শোক সেই টেক্স। কিন্তু আপনার দেহ যে মোহরের বাক্সো। ঐ বাক্সের খুব যত্ন চাই। কে করবে? কে বুঝবে? ঠাকুরই একমাত্র বুঝেছিলেন। জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!

নরেন—মঠের এরা আমায় খুব যত্নে রাখে।

নাগমশাই—যাঁরা যত্ন করছেন, তাঁদেরই কল্যান—বুঝুন আর নাই বুঝুন। সেবার কমতি হলে দেহ রাখা ভার হবে।

নরেন—নাগমশাই, কি যে করছি, কি না করছি—কিছু বুঝতে পারছি না। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেই মতো কার্য্য করে যাচ্ছি, এতে ভালো হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছি না।

নাগমশাই—ঠাকুর যে বলেছিলেন—"চাবি দেওয়া রইল।" তাই এখন বুঝতে দিচ্ছেন না। বোঝামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে। (স্বামীজি একদৃষ্টে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে সারদানন্দের প্রসাদ লইয়া প্রবেশ)

সারদানন্দ—ঠাকুরের প্রসাদ। (নাগমশাই ও অন্যান্য সকলকে প্রসাদ দিলেন)

নাগমশাই—(প্রসাদ লইয়া মস্তকে ঠেকাইয়া) জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ! (প্রসাদ গ্রহণ করিয়া স্বামীজিকে প্রণাম করিয়া) আজ তাহলে আসি (প্রস্থান)

নরেন—জানো নুরমহম্মদ। এই যে নাগমশাইকে দেখলে, এঁর মতো ভক্ত আমি আর দেখি নি। তোর বোধহয় মনে আছে শরৎ, ঠাকুর দেহ রাখবার পর একদিন শুনলুম নাগমশাই চার পাঁচদিন উপোস করে তাঁর কলকাতার খোলার ঘরে পড়ে আছেন। আমি হরিভাই ও আর কে একজন মিলে তো নাগমশাইয়ের কুটিরে গিয়ে হাজির। আমাদের দেখেই লেপমুড়ি ছেড়ে উঠে পড়লেন। আমি বল্‌লুম, আপনার এখানে আজ ভিক্ষে পেতে হবে। অমনি নাগমশাই বাজার

থেকে চাল ডাল এনে রাঁধতে আরম্ভ করলেন। আমরা ভেবেছিলুম আমরা নিজেরা খাবো আর ঐ সঙ্গে ওঁকেও খাওয়াবো। রান্না হলে আমরা নাগমশাই এর জন্য সব রেখে দিয়ে আহারের পর যেই ওঁকে যেতে অনুরোধ করা, অমনি ভাতের হাঁড়ি আছড়ে ভেঙ্গে ফেলে কপালে আঘাতকরে বলতে লাগলেন—যে দেহে ভগবান লাভ হোল না, সে দেহকে আবার আহার দেব? আমরা তো দেখেই অবাক্। অনেক করে, পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে আসি।

সারদানন্দ—নাগমহাশয়, গিরীশ ঘোষ, এঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ না করলেও এঁরাই ঠাকুরের প্রকৃত ভক্ত। আমরা আর কি করলুম?

গুড্উইন্—স্বামীজি। আমি এইবার আপনার কথামত মাদ্রাজে গিয়ে কাজ করবো। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন ভারত-বর্ষকে আমার নিজের দেশ বলে মনে করতে পারি। যাবার বেলা যেন এই মাটিকেই প্রণাম করে যেতে পারি। এখানেই যেন আমার দেহ শান্তিলাভ করে।

নরেন—ঠাকুর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

নুরমহম্মদ—স্বামীজি, আপনি বিদেশে যাবার আগে বলেছিলেন যে দেশে ফিরে এসে আমাকে দীক্ষা দেবেন। আপনি কি এখনও আমাকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না? না কি আমি মুসলমান বলে আপনার শিষ্যত্ব হতে বঞ্চিত। কিন্তু একদিন তো আপনি নিজে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন—ভাই বলে আলিঙ্গনে করেছেন। তবে এখনও বিমুখ কেন? আমাকে বুঝিয়ে দিন, কোন অপরাধে অপরাধী আমি।

নরেন—ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছো ভাই। আজই তোমাকে আমি দীক্ষা দেব। ঠাকুরের কাছ থেকে আমার শিক্ষা—তিনি নিজে মুসলমান, খৃষ্টান কাউকেই আলাদা করে দেখতেন না। তুমি বোধহয় জানো না আমার গুরু—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে একবার মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন। হাঁ ভাই, তোমাকে যতই আমি দেখছি ততই আমি মুগ্ধ হচ্ছি। আমার অন্যান্য হিন্দু শিষ্যদের তুলনায় তুমি কোনমতেই কম নও। আজ থেকে তোমার নাম হ'ল—মহম্মদানন্দ।]

চতুর্থ দৃশ্য

(লণ্ডনে মিস্ মার্গারেটের শয়নকক্ষ। একটি খাটে মার্গারেট অর্দ্ধ-শায়িতা। একটি চেয়ারে মহেন্দ্র বসিয়া আছে। পিছনে সাদা পর্দ্দা। একধারে একটি টেবিলে বই খাতাপত্র এবং দুইটি ষ্টাণ্ডে দুইটি ছবি—একটি যীশুখৃষ্টের ও আর একটি স্বামী বিবেকানন্দের। দুটি মোমবাতি জ্বলিবে। সময় সন্ধ্যা।)

মহেন্দ্র—আপনার জ্বর হয়েছে, আমাকে কেন আগে খবর দিলেন না?

মার্গারেট—সামান্য জ্বর। এর জন্য আর কি খবর দেব বলুন?

মহেন্দ্র—আমার মনে হয় অহেতুক ভেবে ভেবেই আপনার জ্বর হয়েছে। এতো ভাবনার কি আছে?

মার্গারেট—ভাবনার নেই? আজও আমার সাধনা সফল হ'ল না। তা নাহলে তিন তিনখানা চিঠি লিখলুম ভারতবর্ষে যাবার অনুমতি চেয়ে কিন্তু তিনবারই স্বামীজি অনুমতি দিলেন না, লিখলেন—এখনও সময় হয় নি। আমার দ্বারা কি কোন

কাজই হতে পারে না ? আপনি ভাগ্যবান, স্বামীজির স্বদেশে জন্মেছেন।

মহেন্দ্র—আচ্ছা মিস্ নোবল্। আজ কদিন আপনি অসুস্থ। আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আপনার স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ করেছেন ?

মার্গারেট—আপনি বোধহয় জানেন না, আমি স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।

মহেন্দ্র—চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন ?

মার্গারেট—বাধ্য হয়ে রিসাইন্ করতে হ'ল। আমি যখন তখন গরীবদের সাহায্য করি সেটা আমার স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ অর্থাৎ চার্চ্চের লোকদের ঠিক মনোমত হয় না।

মহেন্দ্র—সে কি রকম কথা ? চার্চ্চের লোকেরা চান না যে দরিদ্রের সেবা করা হ'ক ?

মার্গারেট—ঠিক তা নয়। আমাদের চার্চ্চের ইচ্ছে, যে সমস্ত লোক আমাদের অন্তর্গত শুধু তাদেরই সাহায্য করা যেতে পারে। কিন্তু আমার শিক্ষা তা নয়। সেবা কখনও সম্প্রদায় বিশেষের জন্য হতে পারে না। দরিদ্রের আবার জাত কি ? সেদিন দেখলাম পথে এক নিগ্রো ভিখারী একটুকরা রুটির জন্য অতি করুনস্বরে ভিক্ষা করছে। আমি আমার নিজের জন্য কেনা রুটিটা তাকে দিয়ে দিলাম। আমার সঙ্গে তখন আমাদের চার্চ্চের একজন মেম্বার ছিলেন। তিনি আমাকে তীব্র ভৎস'না করেন। আমিও তাই চাকরীতে রেজিগ্‌নেসান্ দিলাম।

মহেন্দ্র—সামান্য রুটির জন্য ?

মার্গারেট—কি যে বলেন ? (হাসিয়া) এই সামান্য রুটির জন্যই একদিন ফরসী বিপ্লব হয়েছিল।

মহেন্দ্র—[ফরাসী বিপ্লবের কাহিনী ইতিহাসে পড়েছি বটে কিন্তু তাতে রুটির কি ব্যাপার ?

মার্গারেট—সে ভারী মজার ব্যাপার। প্যারী সহরে হয় মন্বন্তর। গমের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় রুটি হ'ল মহার্ঘ্য। গরীবদের হ'ল খাবার কষ্ট। একদিন সকালে বড় বড় বাড়ীর ঝি, চাকরানী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সব এক জোট হয়ে পথে বেরিয়ে পড়লো। তারা ঝাঁটা কাঁধে করে রাস্তা দিয়ে প্রোসেসান্ করে বেরিয়ে পড়লো। ক্রমে তাদের সংখ্যা বেড়ে প্রায় পাঁচহাজার দাঁড়ালো। তাদের সঙ্গে মজদুর শ্রেণীর পুরুষেরাও জুটে "রুটি রুটি" করে চিৎকার করতে করতে ভারসেল্‌সের পথে এসে পড়লো। ভারসেল্‌সের রাজপ্রাসাদে অষ্ট্রীয়ার সম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসার কন্যা বিলাসিনী রাণী মেরী এণ্টোয়ানেট ভৃত্যদের জিজ্ঞেস করলেন—লোকগুলো ওরকম চিৎকার করছে কেন ? তারা বললো—They have no bread. রাণী উত্তর করলেন—Let them have cakes. ওদের কেক্ খেতে দাও। কিন্তু কেক্ যে ময়দার তৈরী হয় এবং সেই ময়দারই অভাবে যে ওদের এই অবস্থা একথা রাজা বা রাণীর খেয়াল ছিল না। কিন্তু উন্মত্ত জনসাধারণ মনে করে রাণী ইচ্ছে করেই তাদের অপমান বা বিদ্রূপ করছেন। তারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে রাজা ও রাণীকে বন্দী করে।

রাণীকে তারা Baker's wife বলে বিদ্রূপ করতে থাকে। এটাই হ'ল ফরাসী বিপ্লবের প্রথম দিনের ঘটনা।

মহেন্দ্র—বুঝলুম।] ফরাসী বিপ্লবের মতো বিপ্লবী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা আপনার মনে একটা মহা বিপ্লব এনেছে। আপনার কথাবার্ত্তায়, আমার মনে হচ্ছে এবার আপনি প্রস্তুত হয়েছেন এবং স্বামীজিও নিশ্চয়ই আহ্বান জানাবেন আপনাকে।

মার্গারেট—God bless you.

মহেন্দ্র—অনেকক্ষণ আপনাকে বকালুম। এই অসুস্থ শরীরে আর বেশী কথা বলা উচিত নয়। আপনি এবার শুয়ে পড়ুন। আমি এখন আসি। Good night. Have a nice sleep and happy dreams.

মার্গারেট—ধন্যবাদ। Good bye. (মহেন্দ্র প্রস্থান করিলে মার্গারেট ছবি দুইটির নিকটে গিয়া) তোমাদের দুজনকেই আমি সমান ভক্তি করি—শ্রদ্ধা করি। আমায় শক্তি দাও—বল দাও। দীনদরিদ্রের যেন আমি সেবা করতে পারি। স্বামীজি, আমায় অনুমতি দাও—তোমার দেশে যাবার অনুমতি দাও। তোমার দেশ আজ আর শুধু তোমার একার দেশ নয়—আজ আমারও দেশ—আমিও ভারতবাসী। (ধীরে ধীরে বিছানায় আসিয়া শয়ন করিয়া চাদর চাপা দিল। আলো ক্রমে কমিয়া আসিল। পর্দ্দার পিছনে স্বামীজির মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল) কে-কে, স্বামীজি, কি আদেশ তোমার—বলো বলো নীরবে থেকো না (ক্রমে আবার ঘুমাইয়া পড়িলে মাইকে স্বামীজির কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল)

মাইকে—ভারতবাসীর পক্ষ থেকে আমি তোমায় সাগ্রহে আহ্বান করছি—কিন্তু তার আগে তোমায় জানিয়ে দিতে চাই—যে গুরুভার তোমায় গ্রহণ করতে হবে—তার জন্যে পুরস্কার পাবে হয়তো দারুণ লজ্জা। যে সাধনায় তুমি আত্মসমর্পন করতে চেয়েছো—তার বিনিময়ে আমি তোমায় শোনাতে পারবো না কোন আশার বাণী—কঠোর পরিশ্রম, বিনিদ্র রজনী—অনশন, অর্দ্ধাশন—তীব্র বেদনা—হয়তো এই তুমি পাবে। এই তোমায় দিতে পারি। দরিদ্র, অধঃপতন, আবর্জ্জনা, ছিন্নবসন পরিহিত নরনারী দেখবার যদি সাধ থাকে—তবে এসো। আমরা তোমাদের হৃদয়হীন সমালোচনা সহ্য করতে পারি না। আমার দিক থেকে আমি আমার সমস্ত শক্তি—সমস্ত স্নেহ দিয়ে তোমায় অবিরত ঘিরে রাখবো —মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকবো তোমার পাশে। I will stand by you unto death, whether you work for India or not ; whether you give up Vedanta or remain in it. The tusks of the elephant come out but they never go back. Even so are the words of a man. বেদান্ত তুমি গ্রহণ করো বা না করো, ভারতের জন্যে কাজ করো বা না করো—আমি তোমায় রক্ষা করবো আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে। হাতীর দাঁত একবার বার হলে আর ভেতরে ঢোকে না। আমার কথাও ঠিক তেমনি।

মার্গারেট—স্বামীজি—স্বামীজি—গুরুজি, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।— (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়ী। ভিতরে ঠাকুর ঘর দেখা যাইতেছে। সেখানে সারদামণি পূজা করিতেছেন। বাহিরে চত্বরে বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, প্রভৃতি বসিয়া আছে। গিরীশ ঘোষের প্রবেশ। সময় প্রভাত।)

গিরীশ—শুনলুম নরেন এখানে এসেছে। তাই দেখা করতে এলুম। আজ তো আর নরেন কেউকেটা নয়—বিশ্ববিজয়ী বীর।

বিবেকানন্দ—এসো জিসি (প্রণাম)। জিসি—সেই একদিন আর এই একদিন।

গিরীশ—না, সেই আগেকার নরেনই আছে। কিন্তু কি ইচ্ছে হচ্ছে জানিস্? আরো দেখি, আরো দেখি। (গিরধারীলালের প্রবেশ)

গিরধারী—এখানে স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন শুনে দেখা করতে এলাম। আমি গিরধারীলাল, গোরক্ষিনী সভার সম্পাদক। স্বামীজি পাশ্চাত্ত্য দেশে আমাদের হিন্দুধর্ম্মের জয়গান করে এসেছেন। তাই আপনার কাছে এসেছি কিঞ্চিৎ চাঁদার জন্য। এই দেখুন খাতা।

বিবেকানন্দ—আপনাদের সভার উদ্দেশ্য ?

গিরধারী—আমরা স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন করেছি। দুর্ব্বল, রুগ্ন, জরাগ্রস্ত গোমাতাদের আমরা সেখানে রেখে পালন করি। তাছাড়া কসাইদের হাত থেকে তাদের রক্ষার ব্যবস্থাও করি রীতিমত অর্থব্যয় করে।

বিবেকানন্দ—উদ্দেশ্য সৎ সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনাদের খরচ-খরচা চলে কেমন করে?

গিরধারী—এই আপনাদের পাঁচজন মহাত্মারই দানে। তাছাড়া কয়েকজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী আমাদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের দানের পরিমানই বেশী।

বিবেকানন্দ—কিন্তু মধ্যভারতে শুনছি নাকি ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েছে। প্রায় নলক্ষ লোক মারা গেছে অনাহারে। এই দুর্ভিক্ষ নিবারণে কতো টাকা সাহায্য করেছেন আপনারা?

গিরধারী—দুর্ভিক্ষে সাহায্য আমরা করি না। গোমাতাদের রক্ষা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম।

বিবেকানন্দ—আর মানুষ মরে গেলে তার মুখে এক মুঠো অন্ন দেওয়া বুঝি আপনাদের ধর্ম্ম নয়?

গিরধারী—মানুষ মরছে নিজের কর্ম্মফলে—নিজের পাপে, নিজের—

বিবেকানন্দ—আর গোমাতারা? তারা যে কসাইদের হাতে পড়েন—সেও তো তাদের কর্ম্মফল। তবে আর তাদের বাঁচাবার কি দরকার?

গিরধারী—তা আপনি যা বল্‌ছেন তা সত্য—তবে শাস্ত্রে আছে গাভী আমাদের মাতা।

বিবেকানন্দ—হাঁ, গাভী যে তোমাদের মাতা তা বুঝতে পারছি আমি—তা নাহলে এমন সব ছেলে জন্মাবে কেন? দেখো, যেখানে মানুষের মুখে অন্ন না দিয়ে—পশুপক্ষীদের বাঁচাবার বিরাট চেষ্টা হয়—সেখানে আমার সহানুভূতি নেই। তাছাড়া আমি তো সন্ন্যাসী—আমার টাকা কোথায়? যদি ভিক্ষে-

স্বরূপ কোথাও কিছু পাই—আগে দেব ঐ দুর্ভিক্ষে—মানুষের দুঃখে—মানুষের দুর্দ্দশা নিবারণে। তারপর কিছু বাঁচে তো তোমাদের দিতে পারি। (ধীরে ধীরে মাথা নত করিয়া গিরধারীলালের প্রস্থান) এই জন্যেই দেশটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে।

ব্রহ্মানন্দ—বাঃ বেশ শুনিয়ে দিয়েছো লোকটাকে।

বিবেকানন্দ—দেখো জিসি, তুমি তো জীবনে কোনদিন বেদবেদান্ত কিছু ঘাঁটলে না—চিরকালই কেষ্ট বিষ্টু নিয়ে কাটিয়ে দিলে।

গিরীশ—আমার আর ওসব পড়ে কি হবে বলো? আমার শক্তিও নেই, সময়ও নেই। আমি দূর থেকে বেদবেদান্তকে নমস্কার করে ঠাকুরকে স্মরণ করতে করতে পাড়ি মারবো। তোমাকে দিয়ে তাঁর লোক শিক্ষার দরকার ছিল—তাই তোমাকে ওসব পড়তে হয়েছে। জয় বেদরূপী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জয়!

বিবেকানন্দ—ঠাকুর বলতেন—গিরীশ ভৈরবের অবতার। ও যা করছে করুক, আর কিছু করতে হবে না ওকে।

গিরীশ—আচ্ছা নরেন, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি। বেদ-বেদান্ত তো ঢের পড়েছো তুমি কিন্তু তাতে দুঃখীর দুঃখ, বুভুক্ষুর আর্ত্তনাদ, আর ব্যাভিচারাদি পাপ নিবারণ করবার কোন উপায় আছে কি? কোথাও দুর্ব্বৃত্তের কবলে পড়ে কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম যাচ্ছে—কোথাও শয়তান অসহায়া বিধবার সর্ব্বস্ব ঠকিয়ে নিচ্ছে—এ সবের প্রতিকার কি? সমাজ যে কলঙ্কে ভরে উঠলো ভাই।

বিবেকানন্দ—দেখো জিসি, আমার মনে হয়—যদি জগতের দুঃখ নিবারণের জন্যে—একটি জীবের দুঃখও কিছু লাঘব করতে

পারি—আমি হাজারবার গর্ভবাসের ক্লেশ সহ্য করতে প্রস্তুত। শুধু নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে বলো? সকলকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি তবে!

গিরীশ—এতো বড় হৃদয় না হলে কি তুমি জগৎ মাতাতে পারতে?

(সারদামণি মন্দির হইতে বাহিরে আসিলেন)

সারদা—নরেন, তুই কি আমাকে খুঁজছিলি?

বিবেকানন্দ—হাঁ মা (প্রণাম)। তোমার অনুমতি নেবার জন্যেই আজ আমি এখানে এসেছি।

সারদা—কিসের অনুমতি বাপ্?

বিবেকানন্দ—কদিন ধরে আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা হ'ক। কাল আমার এক শিষ্য মহম্মদানন্দ স্বপ্ন দেখেছে যেন মা দুর্গা গঙ্গার ঘাট থেকে মঠের ভিতরে প্রবেশ করছেন। এরপর তো আর দুর্গা পূজা না করে থাকা যায় না। তুমি কি বলো মা?

সারদা—ওরে, এর জন্যে আমার মতের দরকার? এটা কি জানিস্ না যে তোর ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। জানিস্, ঠাকুর যেদিন দেহ ছাড়বেন, বিছানায় বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে আছেন। আমাকে আর লক্ষ্মীকে ডেকে পাঠালেন। আমারা আসতে বল্‌লেন—এসেছো? দেখো, আমি যেন কোথায় যাচ্ছি, জলের ভেতর দিয়ে—অনেক, অনেক দূর। আমি কাঁদতে লাগলুম, বুঝলুম ঠাকুর আর থাকবেন না। ঠাকুর বললেন—কাঁদছো কেন? তোমার ভাবনা কি? তুই সামনে দাঁড়িয়েছিলি, তোর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—তোমার তো

নরেনই আছে। তুই তো আমারই সন্তান তোর কোন ইচ্ছেই কি আমি অপূর্ণ রাখতে পারি? নিশ্চয়ই মঠে প্রতিমা এনে মায়ের পূজো হবে।

নিরঞ্জনানন্দ—বাঃ বাঃ, কি মজা! আমি এখনই যাই মঠে। সকলকে খবর দি। আর তো বেশী দেরী নেই পূজোর।

ব্রহ্মানন্দ—কিন্তু সঙ্কল্প হবে কার নামে?

বিবেকানন্দ—মার পূজো। কাজেই মার নামেই সঙ্কল্প হবে।

সারদা—কিন্তু একটা কথা—পূজোয় কিন্তু পাঁঠাবলি হবে না।

গিরীশ—[এইতো মায়ের মতো কথা। কখনও বলি হবে না।

প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
কাতর প্রাণের তরে মানব যেমতি!
মানবের প্রায়,
অস্ত্রাঘাতে ব্যাথা লাগে কায়—
বেদনা জানাতে নারে।
বধি তারে ধর্ম্ম উপার্জ্জন,
না হয় কখন—
বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে।
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান।

লাটু—ওমনি গিরীশের নাটক আরম্ভ হয়ে গেল।] (মার্গারেটের প্রবেশ)

মার্গারেট—স্বামীজি, স্বামীজি—

বিবেকানন্দ—সামনে আমার মা—আমার জ্যান্ত দুর্গা, আগে ওঁকে প্রণাম করো—

মার্গারেট—মা—মা (আশ্চর্য্য হইয়া) আপনি—তুমি মা—তুমি—তুমি কি এই বিদেশিণীকে গ্রহণ করতে পারবে ? (প্রণাম) মা—

সারদা—এসো মা এসো, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক। এসো ঠাকুরঘরে আগে ঠাকুরকে প্রণাম করবে এসো।

মার্গারেট—আমি ঠাকুরঘরে যাব ? আমি যে খৃষ্টান।

সারদা—ওরে ঠাকুরের কাছে কি জাত আছে ? তিনি যে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয় করবার জন্য অবতার হয়ে এসেছিলেন। ওরে অ ক্ষান্তমণি, একবার শুনে যা তো মা (ক্ষান্তমণির প্রবেশ) এসো মা—(দুইজনের ঠাকুর ঘরে প্রস্থান) এবং কিছুক্ষণ পরে পুণরায় ফিরিয়া আসিয়া সিঁড়ির উপর উপবেশন)

ক্ষান্তমণি—আমায় ডাকছো মা ?

সারদা—দেখ্ দেখ্, কে এসেছে ?

ক্ষান্তমণি—এ কে মা ? এ যে দেখছি পদ্মফুল !

সারদা—হাঁ, শ্বেতপদ্ম। আমার নরেন এনেছে বিলেত থেকে ঠাকুরের নৈবদ্যে দেবে বলে। যা যা এর জন্য ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে আয়। (ক্ষান্তর প্রস্থান ও রেকাবীতে দুটি সন্দেশ লইয়া প্রবেশ করিলে সারদামণি নিজহস্তে সেই সন্দেশ মার্গারেটকে খাওয়াইতে লাগিলেন)

বিবেকানন্দ—কেবলরাম, তোমার স্ত্রীর মাথায় গোলমাল হয়েছিল শুনেছিলুম। এখন কি একেবারে সেরে গেছে ?

কেবলরাম—আজ্ঞে হাঁ দ্যাবতা। মার কৃপায় সবই হয়। মার কৃপা হলে পঙ্গুও গিরী লঙ্ঘন করতি পারে, মূকও বাচাল হতে পারে। মা কৃপা করে হতভাগিনীকে গ্রহণ করেছেন।

বিবেকানন্দ—মা তারা—ব্রহ্মময়ী।

সারদা—এইবার তুমি মা নরেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলো। আমি ভিতরবাড়ী যাই, দেখি রান্নার কতদূর কি হ'ল ?

ক্ষান্তমণি—ওদিকে যোগীনমা ঠাকুরের ভোগ চড়িয়ে দিয়েছে। চলো মা (রেকাবী ও গেলাস লইয়া সারদামণির সহিত প্রস্থান। তারপর মার্গারেট সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিয়া বিবেকানন্দের মুখোমুখি দাঁড়াইল)

মার্গারেট—স্বামীজি, মা আমায় গ্রহণ করেছেন। তবে আপনি কেন এখনও দেরী করছেন ?

বিবেকানন্দ—তোমার শিক্ষার ভার দিয়েছি সুপণ্ডিত স্বামী স্বরূপানন্দের ওপর। আগে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, আমাদের সব ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করো—হিন্দুধর্ম্মকে বোঝবার চেষ্টা করো—এই বিশাল দেশ—ভারতবর্ষকে জানো—তারপর সময় হলেই নিজে আমি তোমাকে দীক্ষা দোব।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(বেলুড় মঠের একটি কক্ষ। কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও ভক্তের সহিত স্বামীজি বসিয়া হাস্য পরিহাস করিতেছেন। কেবলরাম প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিল। সময় প্রভাত।)

বিবেকানন্দ—(হাসিয়া) আরে ও কি হ'ল ? রামানুজ ঢঙে প্রণাম কর।

সারদানন্দ—তা কি করে হয় ? ওর পায়ে যে বাত। ও কি পারবে ? (সকলে হাসিয়া উঠিলে কেবলরাম আবার উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল)

বিবেকানন্দ—অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ জানিস্ তো ? ওঠ্ ওঠ্।

কেবলরাম—আজ্ঞে আপনাকে এখন দেখলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কথা মনে পড়ে।

মহম্মদানন্দ—সে কি, শুক্রাচার্য্যের সঙ্গে আমাদের গুরুমহারাজের কি সম্পর্ক ? তিনি হলেন দৈত্যগুরু। আর ইনি আমাদের মতো সন্ন্যাসীদের গুরু।

বিবেকানন্দ—(হাসিয়া) ঠিক বলেছিস্, ঠিক বলেছিস্, শুক্রাচার্য্য —হাঃ হাঃ—শুক্রাচার্য্য ! দৈত্যগুরুর একটা চোখ একেবারে অন্ধ ছিল আর আমিও তো আজকাল একটা চোখে ভাল দেখতে পাই না। হাঃ হাঃ তার ওপর ও বলতে চায় যে আমি সাহেবদের গুরু—হাঃ হাঃ, বেশ বলেছিস্, বেশ বলেছিস্।

কেবলরাম—আজ্ঞে তাও কি কইতে পারি ? (পুনরায় সকলে হাসিয়া উঠিল। এমনি সময়ে জাপান হইতে আগত ওকাকুরার প্রবেশ।) এই যে জাপানী সাহেব অক্রুর খুড়ো, আসেন, আসেন।

বিবেকানন্দ—অক্রুরখুড়ো—হাঃ হাঃ অক্রুরখুড়ো—বাঃ বাঃ, বেশ নাম বার করেছিস্ তো—ওকাকুরা একেবারে অক্রুরখুড়ো ! হাঃ হাঃ।

সারদানন্দ—তা অক্রুরখুড়ো মানেটা কি হ'ল ?

কেবলরাম—আজ্ঞে হ্যাবতাকে জাপানে লইবার তরে আইছেন এই জাপানী সাহেব—নাম কি না ওকাকুরা। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইতে আইলেম কে, না—অক্রুর। তাই তো এনার নাম রাখছি অক্রুরখুড়ো। (সকলে হাসিয়া উঠিল)

ওকাকুরা—স্বামীজি, আমার দেশের জনগণ আপনার পথ চেয়ে বসে আছে—কবে তারা স্বামীজিকে আবার দেখতে পাবে—কবে আপনার উপদেশ শুনতে পাবে ?

শশি—তুমি কি সত্যিই জাপানে যাবে ?

বিবেকানন্দ—জাপান গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে ওকাকুরা সেইজন্যই এসেছেন। জাপান বেশ দেশ, তারা শিল্পবিদ্যা দৈনন্দিন-কার্য্যেতেও পরিণত করেছে। আমি অ্যামেরিকা যাবার সময় জাপান দেখি। [ওদের দেশে দেখলুম গৃহগুলি বংশনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সামনে একটা করে বাগান আছে, তাতে কিছু ফুলের গাছও আছে। ওদের ঘরগুলি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জাতটা খুব করছে।] ঠাকুরের কৃপায় যদি আবার জাপান যাওয়া হয়, মহম্মদানন্দ, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবো। দেখবে জাপানীরা কেমন পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা অধিকার করেছে। তারা ধর্ম্মে বৌদ্ধ কিন্তু ধর্ম্মের দিকে অনাস্থা, বেদান্তভাব কিছু ওদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলে ওদের খুব মঙ্গল হবে।

শশি—কিন্তু তাতে ভারতের কি উপকার হবে ?

ওকাকুরা—উভয় জাতের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান উভয় জাতেরই মঙ্গল হবে এবং তাতে উভয় জাতই সমভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে।

বিবেকানন্দ—ঠিক বলেছে ওকাকুরা। ওরা একটা জাত বটে।

সারদানন্দ—কিন্তু তোমার শরীরের এই অবস্থা এখন জাপান যাওয়া কি ঠিক হবে? হাঁপানীতে বড়ই কাবু করে দিয়েছে তোমাকে।

বিবেকানন্দ—সত্যিই, এই অবস্থায় জাপান গেলে শুধু যে আমার কষ্ট তা নয়। তোমাদেরও বিব্রত করা হবে। যদি ঠাকুরের ইচ্ছে হয়, যদি আমার শরীর সেরে যায় তাহলে আর একবার জাপান নিশ্চয়ই যাবো তোমাকে কথা দিলাম ওকাকুরা।

ওকাকুরা—তাহলে আমি চলি—সম্রাটকে এই কথাই জানাবো। আপনাকে সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে জাপানীরা বড়ই ব্যথিত হবে। তবে আশার কথা আপনার শরীর সেরে গেলে আপনি নিশ্চয়ই আসবেন। ভগবান তথাগত আপনার মঙ্গল করুন (নমস্কার করিয়া প্রস্থান)।

বিবেকানন্দ—"করালি! করাল নাম তোর, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে,

তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ডবিনাশে।"

জানিস্ আলমোড়ায় একদিন মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি কলেজের উন্নতি কি করে করা যায় জিজ্ঞাসা করায় কি বলেছিলুম জানিস্?

সারদানন্দ—কি বললে?

বিবেকানন্দ—বললুম—আপনার কলেজের ছাত্রদের গড়ে তুলুন সত্যিকার মানুষ করে। তাদের চরিত্র দৃঢ় হয় যেন বজ্রের

মতো। প্রত্যেকে হবে এক একটি দধীচি—তাদের অস্থিতে যে বজ্র তৈরী হবে—তাতে ভারতের পরাধীনতা দূর হয়ে যাবে চিরকালের জন্যে। আরও বললুম—যে সব ছেলে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান গাইবে, চাবুক মারবেন তাদের পিঠে। আজ প্রয়োজন হচ্ছে—শক্তি, স্বাস্থ্য-তেজোদৃপ্ত মন—বুকভরা সাহস। যারা শক্তিহীন—তারা প্রেমের গান গায় কোন লজ্জায় ?

শশি—কিন্তু ভাই সেদিন তোমার মিস্ মার্গারেটকে দিয়ে তামাক সাজিয়ে নেওয়াটা ঠিক হয় নি। একঘর লোক—তারমধ্যে সাহেব ও মেম রয়েছেন, সেখানে তুমি হঠাৎ ওকে বল্‌লে তামাক সেজে দিতে।

বিবেকানন্দ—ওকে অপমান করবার জন্যে আমি তামাক সাজতে বলিনি রে। আমি শুনেছিলুম এ দেশের কোন কোন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধারনা যে আমি নাকি শ্বেতাঙ্গদের স্তুতি দ্বারা তাদের আপন শিষ্য করতে সমর্থ হয়েছি। তাদের সম্মুখে পাশ্চাত্য মহিলাকে আপন সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করে আমি বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি যে ঐ ধারণা কত ভুল। আর তা ছাড়া আমার বিশ্বাস মার্গারেট নিজেও—(মার্গারেটের প্রবেশ। সদ্যস্নাতা—পরণে লালপাড় গরদের শাড়ী)

মার্গারেট—আমি একটুও দুঃখিত হই নি স্বামীজি—আপনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হবেন না। আপনাকে সেবা করবার অধিকার পাওয়ায় আমি নিজেকে গর্ব্বিত মনে করেছি।

বিবেকানন্দ—দেখ্ দেখ্ তোরা চেয়ে দেখ্ মার্গারেটের দিকে আজ ওকে ঠিক আমাদের ঘরের মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে।

মার্গারেট—এখনও কি সময় হয় নি স্বামীজি? আপনার কথামত হিন্দুধর্ম্মের সব কখানি পুস্তকই আমি পড়েছি। এবার আমাকে দীক্ষা দিন—আমার প্রাণ আকূল হয়ে আছে (পদপ্রান্তে পতিত)।

বিবেকানন্দ—হাঁ, এইবার সময় হয়েছ। আশীর্ব্বাদ করি, যাও বৎসে, তুমি তাঁর অনুরসণ করো, যিনি বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বে পাঁচশতবার নিজেকে লোককল্যাণব্রতে উৎসর্গ করেছেন। আজ থেকে তোমার নতুন জন্ম হ'ল—এ আবর্ত্তন নয়, বিবর্ত্তন নয়--পরিবর্ত্তন নয়—সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি। আজ থেকে তোমার নাম হ'ল—নিবেদিতা। (নেপথ্যে মাইক ধ্বনিত হ'ল)

মাইকে—ভগিণী নিবেদিতা—ভারতসেবিকা নিবেদিতা—শ্রীরামকৃষ্ণের নিবেদিতা—স্বামী বিবেকানন্দের নিবেদিতা।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(বেলুড়ের একটি কক্ষ। পিছনে সাদা পর্দ্দা। এক কোনে চৌকির উপর বিছানা পাতা। স্বামীজি বিশ্রাম করিতেছেন। সময় দুপুর। (ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ, হাতে একটি হিসাবের খাতা।)

ব্রহ্মানন্দ—দেখো নরেন, মঠের এই হিসেবটা একটু দেখো।

বিবেকানন্দ—আঃ, তোরা কি আমাকে একটুও বিশ্রাম করতে দিবি না? এখন থেকে তোরা নিজেরাই সব দেখে শুনে নে, আমাকে ছুটিদে—আমি আর পারছি না।

ব্রহ্মানন্দ—কিন্তু তুমি যে কারিগরী বিদ্যালয় খোলবার কথা বলেছিলে সেটার তো কোনই মিমাংসা হ'ল না।

বিবেকানন্দ—এটা এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয় যে তার মীমাংসার জন্যে তোদের এখানে ছুটে আসতে হবে। এটুকু বুদ্ধি বিবচনা-খরচ যদি না করতে পারিস্ তবে তোরা কি করে কাজ চালাবি? এই দেখ্ দেখি নিবেদিতা—কেমন নিজের মাথা খাটিয়ে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যাচ্ছে—আমাকে একেবারে বিরক্ত করে না।

ব্রহ্মানন্দ—বেশ, তুমি বিশ্রাম করো, এখন আর বিরক্ত করবো না। কদিন ধরে তোমার শরীর তো ভাল যাচ্ছে না। (প্রস্থান করিলে স্বামীজি একখানা বই পড়িতে আরম্ভ করিলেন, লাটুর প্রবেশ)

লাটু—অভেদানন্দস্বামী জানতে চাইলেন এই চিঠিটার কি উত্তর দেওয়া হবে?

বিবেকানন্দ—যাও যাও আমাকে বিরক্ত কোর না। ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, অভেদানন্দ এরা সব কি করতে আছে? যাও (লাটুর প্রস্থান। একজন সাঁওতাল নাম কেষ্টা প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটি কোদাল।)

কেষ্টা—আরে স্বামী বাপ্, তুই হামাকে ডাক্‌লি কেনে রে?

বিবেকানন্দ—আয় আয় কেষ্টা আয়।

কেষ্টা—দেখ্ স্বামী বাপ্, তুই হামাদের কাজের বেলা এখানকে আসিস্ না—তোর সঙ্গে কথা বোল্‌লে হামাদের কাজ বন্ধ হইয়া যায়, আর বুড়োবাবা এসে বড্‌ডো বকাবকি করে। হামাদের বড্‌ডো দুঃখু হয় রে, বড্‌ডো দুঃখু হয়।

বিবেকানন্দ—না না অদ্বৈতানন্দ আর তোদের বোকবে না। দেখ্ তোরা আজ আমাদের এখানে খাবি?

কেষ্টা—হামরা যে তোদের ছোঁয়া এখন আর খাই না, এখন যে বিয়া হয়েছে। তোদের ছোঁয়া নুন খেলে জাত যাবে রে বাপ্।

বিবেকানন্দ—নুন কেন খাবি ? নুন না দিয়ে তরকারী রেঁধে দেবো, তাহলে খাবি তো ?

কেষ্টা—তা কেনে খাব না রে ?

বিবেকানন্দ—লাটু, শরৎ, বাবুরাম ! (দু-তিনজনের প্রবেশ) ওরা আজ এখানে খাবে। তরকারিতে নুন দিস্ নি। লুচি, তরকারি, মেঠাই, মণ্ডা, দৈ সব জোগাড় কর, এরাই তো নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হবে।

কেষ্টা—আমি তবে সকলকে ডেকে নিয়ে আসি রে। (প্রস্থান)

বিবেকানন্দ—দেখ্ এরা কেমন সরল। এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি ? নয়তো গেরুয়া পরে আর কি হ'ল ? পর-হিতে সর্ব্বস্ব অর্পণ—এরই নাম সন্ন্যাস। ইচ্ছে হয় মঠ ফট সব বিক্রী করে দি, এই সব গরীবদুঃখী, দরিদ্রনারায়ণদের বিলিয়ে দি। [আহা, দেশের লোক খেতে পোরতে পারছে না—আমরা কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি ? ওদেশে যখন গিয়েছিলুম—মাকে কতো বল্লুম—মা এখানে লোক ফুলের বিছানায় শুচ্ছে, চর্ব্বচোষ্য খাচ্ছে, কি না ভোগ কোরছে। আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে, মা তাদের কোন উপায় হবে না ? ওদেশে ধর্ম্মপ্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, এ দেশের জন্য যদি অন্ন সংস্থান করতে পারি। (এই সময়

ধীরে ধীরে নিবেদিতা প্রবেশ করিলেন কিন্তু স্বামীজি তাহাকে না দেখিয়াও বলিতে লাগিলেন) দেশের লোক দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না দেখে একেক সময় মনে হয়—ফেলে দি তোর শাঁখ বাজানো, ঘণ্টা নাড়া, ফেলে দি তোর লেখা-পড়া ও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—সকলে মিলে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে কড়ি পাঁি যোগাড় করে নিয়ে আসি ও দরিদ্রনারায়ণের সেবা করি আহা, দেশের গরীব দুঃখীর জন্যে কেউ ভাবে না রে। যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে—যে মেথর মুদ্দফরাস্ একদিন কাজ বন্ধ করলে সহরে হাহাকার রব ওঠে—হায় তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেইরে !

নিবেদিতা—স্বামীজি !

বিবেকানন্দ—তুই এসেছিস্ মা। আয় আয়, তোর কথাই ভাব-ছিলুম। তুইই পারবি—তুইই পারবি এদের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করতে। আরে তোরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখচিস্ ? নিবেদিতা আজ আমার এখানে খাবে। যা যা ওর জন্যে খাবার নিয়ে আয়। (সকলের প্রস্থান)

নিবেদিতা—সে কি গুরুদেব ? আজ আপনার একাদশী। আপনি আজ অভুক্ত থাকবেন আর আপনার সামনে বসে বে আমি খাব ? তা কি করে হয় ? আমি না হয় আর একদি খাবো।

বিবেকানন্দ—না রে তা হয় না। আজ আমি নিজে তোকে

খাওয়াবো। তোর মনে আছে, লণ্ডনে সারদানন্দের কাছে শুনেছিলি যে আমি, ভালো রাঁধতে পারি তখন আমার হাতের রান্না খাবার তোর খুব ইচ্ছে হয়েছিল।

নিবেদিতা—তা হয়েছিল, কিন্তু আজ—

বিবেকানন্দ—হাঁ, আজ আমি নিজের হাতে রান্না করতে পারি নি বটে কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোকে খাওয়াবো। (লাটু একহাতে আসন ও অন্যহাতে থালা গেলাস লইয়া প্রবেশ করিল) দে দে, এখানেই ঠাঁই করে দে। বসো বসো, তুমি খেতে বসো নিবেদিতা। (নিবেদিতা খাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজি নিজের হাতে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে আর একজন সন্ন্যাসী একটি জলের জাগ ও গামলা রাখিয়া গেল হাত ধুইবার জন্য) আজ আমাদের জন্যে বিশেষ কিছুই রান্না হয়নি—শুধু ভাত, আলুসেদ্ধ, কাঁঠালবিচি সেদ্ধ আর দুধ। তোমার খেতে খুবই কষ্ট হল।

নিবেদিতা—একদিন হয়তো কষ্ট হতো। কিন্তু আজ যে এর বেশী খেতে আমি অভ্যস্ত নই তা তো আপনি জানেন স্বামীজি। (হাত ধুইতে গেলে স্বামীজি নিজে জল ঢালিয়া দিলেন তাহার হাতে এবং ধোওয়ার পর একখানা তোয়ালে দিয়া তাহার হাত মুছাইয়া দিলেন)

নিবেদিতা—এ কি করছেন গুরুদেব? কোথায় আমরা আপনার সেবা করবো না আপনি আমাদের সেবা করছেন?

বিবেকানন্দ—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) তা হোক্। যীশুখৃষ্ট কি করেছিলেন? নিজের শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেন নি?

নিবেদিতা—কিন্তু সে তো শেষ দিনে।

বিবেকানন্দ—ঠিক তাই। (নিবেদিতা তাঁহার দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

নিবেদিতা—আমি এবার আসি স্বামীজি। আপনি তো জানেন বাগবাজারে প্লেগ লেগেছে। আমার তো এখন মরবারও সময় নেই। তার ওপর মেথররা আসছে না, পাড়ায় পাড়ায় জঞ্জালের স্তূপ হয়ে আছে। পাড়ার কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে আমি নিজে সে সব পরিষ্কার করছি। এখন আসি তাহলে (প্রণাম করিয়া প্রস্থান)

বিবেকানন্দ—Keep up my flag flying my dear child. (ধীরে ধীরে তিনি চৌকিতে শুইয়া পড়িলেন) (নেপথ্যে সন্ন্যাসী ও মহামায়ার গান)

"কাঠুরে তুই দূর বনে যা, দূর বনে যা এই বেলা
কেঠো বনে কাল কাটালি ঘুচলো না তোর জঠর জ্বালা॥
শ্রীরামকৃষ্ণ দিলেন বলে, মিলে ধন দূর বনে গেলে, ও কাঠুরে--
(ও তুই) এবার যা দূর বনে চলে, পাবি চন্দনের চ্যালা॥
আরও যদি যাস্ এগিয়ে, রজত খনি দেখবি গিয়ে, ও কাঠুরে--
(ওরে) তারও ধারে সোনা হীরে মণি-মানিক্য রত্ন মেলা॥
দেহের মাঝে আছে সে বন, যদি না পাস্ তার অন্বেষণ, ও কাঠুরে,-
ধর ওরে রামকৃষ্ণচরণ সেবন যার করেন কমলা॥"

গান শেষ হইলে লাটু, শরৎ (দু-তিনজনের প্রবেশ)

উঃ—আঃ—বড় কষ্ট—

ব্রহ্মানন্দ—খুব কি কষ্ট হচ্ছে ? (একজন পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল)

সারদানন্দ—লাটু, তুমি ভাই শিগ্‌গির মহেন্দ্র ডাক্তারকে খবর দাও—না না, বাগবাজার থেকে ডাক্তার বিপিন ঘোষকে ডেকে নিয়ে এসো। খুব ভালো মনে হচ্ছে না। খুব কি কষ্ট হচ্ছে ?

বিবেকানন্দ—কষ্ট ? না ভাই, কষ্ট কি ? তোমরা রইলে--নিবেদিতা রইলো—তোমরাই আমার আরব্ধ কাজ শেষ করবে। ঐ ঠাকুর আমাকে ডাক্‌ছেন—আজ আমার আনন্দের দিন। মঠের সব কাজে নিবেদিতার পরামর্শ নিস্—ও মানবী নয় দেবী। আমি পারলুম না, আমার কাজ তুমি চালিয়ে যেও নিবেদিতা—(ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো কমিয়া আসিল) এবং পর্দ্দার পিছনে আলো জ্বলিলে দেখা গেল যোগিণী নিবেদিতাকে। নিবেদিতার মুখ হইতে কথা বাহির হইল। নেপথ্যে করুণ সুরে বেহালা বাজিবে।)

নিবেদিতা—(পর্দ্দার পিছনে ছায়ামূর্ত্তি) আমার আদর্শকে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে। আর তা এই--মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী পৌঁছে দেওয়া আর সব কাজে এই দেবত্ব বিকাশের পথ নির্দ্ধারণ করে দেওয়া। জগৎকে আলো দেবে কে ? আত্মবিসর্জ্জনই ছিল অতীতের কর্ম্মরহস্য। যারা সর্ব্বাধিক সাহসী ও বরেণ্য তাদেরকে চিরদিন বহুজনের সুখ আর হিতের জন্যে আত্মবিসর্জ্জন করতে হবে। অনন্ত প্রেম আর করুণা বুকে নিয়ে শত শত বুদ্ধের আবির্ভাবের

প্রয়োজন আছে। জগতের ধর্ম্মগুলি এখন প্রাণহীন ব্যঙ্গমাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে। জগতের এখন যা একান্ত প্রয়োজন তা হচ্ছে চরিত্র। জগৎ এখন তাদের চায় যাদের জীবন প্রেম-দীপ্ত, যারা স্বার্থহীন। সেই প্রেমই প্রত্যেকটি বাক্যকে বজ্রের মতো শক্তিশালী করবে। তোমার মধ্যে এমন শক্তি আছে যা পৃথিবী নড়িয়ে দিতে পারে। আর আমি জানি তোমার মতো আরো অনেকে আসবে। চাই জ্বালাময়ী বাণী আর তারচেয়ে জ্বালাময় কর্ম্ম। হে মহাপ্রাণ, ওঠো, জাগো। সংসার দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, তোমার কি নিদ্রা সাজে?

(ধীরে ধীরে যবনিকা নামিয়া আসিল)

ড্রপ্